# প্রেমের নোটবুক

কৌশিক মজুমদার

# তোপসের নোটবুক

# তোপসের নোটবুক

## ফেলুদার সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় ও অন্যান্য

কৌশিক মজুমদার

সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতিতে

## প্রাক্‌কথন

কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলাম সেদিন। প্রেসিডেন্সির দেওয়ালটা শেষ করে সবে কলুটোলায় বাঁক নিয়েছি, এমন সময় চেনা দোকানি বললে, 'সত্যজিতের বই নেবেন নাকি? ফেলুদার?'

'আছে আমার কাছে,' বলে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। দোকানি লোভ দেখাল। সব সই করা। সত্যজিতের। এবার চমকে গেলাম। লোকটা বলে কী? দড়ি দিয়ে বাঁধা গাঁটরি খুলতেই একের পর এক *বাদশাহী আংটি, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, সোনার কেল্লা* সমেত গোটা ফেলুদা সিরিজের ফার্স্ট এডিশন। ঝাঁ-চকচক করছে। একেবারে মিন্ট কন্ডিশন। প্রতিটাতেই প্রথম পাতায় জ্বলজ্বল করছে ইতি চেনা সেই সই। সত্যজিতের য-ফলাকে ইংরেজি এস অক্ষরের মতো স্টাইলাইজেশন। গাঁটরির ঠিক নীচেই এক কোনায় চোখে পড়ল খাতাটা। সবুজ কাপড়ে বাঁধানো। অনেকটা এই ধরনের খাতা জি সি লাহা কিংবা অক্সফোর্ড বিক্রি করত এককালে। পাশে সোনার জলে 'নোটস' লেখা। ডায়েরি লিখতে ব্যবহার করতেন অনেকে... হাতে তুলে নাম দেখে মুচকি না হেসে পারলুম না। কাঁপা কাঁপা হাতে প্রথম পাতায় লেখা, শ্রীতপেশ রঞ্জন মিত্র, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২।

নামটা চেনা চেনা লাগায় পরের পাতা ওলটাতে বাধ্য হলাম। ওপরের দিকে গোটা গোটা হরফে লেখা—

## মিত্র বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও অন্যান্য

আর সেটা পড়তে গিয়েই হাই ভোল্টেজ স্পার্ক। এ কী দেখছি! এ যে রত্নখনি!! পাতায় পাতায় এমন সব কাহিনি যার কিছুটা জানা, আর অনেকটাই অজানা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল মশাই। চিমটি কেটে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। স্বপ্ন দেখছি না তো! দোকানদার বললেন দক্ষিণ কলকাতায় রজনী সেন রোডে কোন এক বাড়ির এক বুড়ো ভদ্রলোক সদ্য মারা গেছেন। তাঁর বাড়ির লাইব্রেরিতেই এসব বই পাওয়া গেছে। আর এই নোটবুক। বইগুলোর যা দাম চাইল কেনার সাধ্য ছিল না। নোটবইটা দরাদরি করে দেড়শোতে কিনে নিলাম। যা পেলাম, আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। এতে আমার কৃতিত্ব কিচ্ছু নেই।

## আমার কথা

আমাদের বংশের ইতিহাস, বা পদবির ইতিহাস নিয়ে খুব বেশি কিছু আমার জানা নেই। তবু মাঝেমধ্যে এখন পুরোনো কথা মনে পড়ে। তাই অনেকদিন বাদে লিখতে বসেছি। আজ এক বিশেষ দিন। আমার ষাট বছর হল আজকেই। এতদিন এক বেসরকারি ফার্মে হিসেব-নিকেশ রাখার কাজ করতাম। আজ থেকে আমি মুক্ত। কী করব বুঝতে পারছি না। বিয়ে করিনি, বন্ধু বলতে যে দু-জন ছিলেন, তাঁরাও এখন ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন। তাই মনে হচ্ছে আবার লিখি। আগের মতো অগোছালো নয়। গুছিয়ে। লেখালেখির শখ ছিল। দাদার সঙ্গে ঘোরাঘুরি আর অ্যাডভেঞ্চারের কথা সব লিখে রাখতাম নোটবুকে। তবে গুছিয়ে লিখতে পারি না বলে লজ্জায় সেসব লেখা প্রকাশের কথাই ভাবিনি।

আমার জ্যাঠতুতো দাদার খুব কাছের বন্ধু ছিলেন অরুণদা। মানে উত্তমকুমার। প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। দাদাকে অ্যাডমায়ার করতেন খুব। বলতেন, 'তোর জীবনটা আমায় খুব টানে, জানিস। ছোটো বয়সে মা-বাবা হারা, কাকার কাছে মানুষ, তোর আত্মসচেতনতা... সবটাই...।' সত্যজিৎবাবু যখন 'নায়ক'

ছবিটা বানালেন, তখন আমি আর দাদা পূর্ণ সিনেমায় দেখতে গিয়েছিলাম। দাদা দেখেই হেসে বলল, 'দেখেছিস, অরুণ কেমন আমার জীবনটা চরিত্রে বসিয়ে দিয়েছে।' অরুণদাই আমার সঙ্গে সত্যজিৎবাবুর আলাপ করালেন। সত্যজিৎবাবুর সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটে অরুণদার সঙ্গে আমি আর দাদা গেছিলাম। নায়ক রিলিজের কিছুদিন আগে দাদা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর জেনে সত্যজিৎবাবু সরাসরি দাদাকে অভিনয়ের অফার দেন। দাদা একপেশে হাসি হেসে জানায়, 'অভিনয়টা আমার একেবারেই আসে না।' অগত্যা চিড়িয়াখানা-তেও অরুণদাই ব্যোমকেশের ভূমিকায় অভিনয় করে। দাদা রাজি হলে কী হত কে জানে।

আমি সুযোগ পেয়ে মানিকবাবুকে আমার অভিজ্ঞতার টুকরোটাকরা দেখালাম। দেখাতেই মানিকবাবুর চোখ জ্বলে উঠল যেন। বললেন, 'আমরা আবার নতুন করে "সন্দেশ" পত্রিকা বার করছি জানো তো, সেখানে যদি তোমার দাদার এইসব কীর্তি, আমার ভাষায়, তোমার নামেই প্রকাশ করি, আপত্তি আছে?' আমি এককথায় রাজি।

যতদিন বেঁচে ছিলেন মানিকবাবু লিখে গেছেন আমাদের অভিজ্ঞতার গল্প। আমার নামে। আমরা দেখতাম। আনন্দ পেতাম। কিন্তু এই ষাট বছরে, আমার মনে হয় আমার আরও কিছু বলার আছে। নিজের ভাষায়, নিজের লেখনীতে। যা মানিকবাবু বলে যেতে পারেননি, '৯২-এর সেই চলে যাওয়ায়... তাই, হয়তো নিজের জন্যেই আমি লিখে যাচ্ছি, আমাদের নিজেদের কথা। ভবিষ্যতের কোনো পাঠক এ নোটবই পড়বে এ আশা রাখি না।

১

বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বজ্রযোগিনী গ্রাম অবস্থিত ছিল। সাতাশটি পাড়া নিয়ে একে ছোটোখাটো পরগনা বলা যেত। অনেকে বলেন বৌদ্ধাচার্য শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর নাকি এখানেই জন্মেছিলেন। সত্যি মিথ্যা জানি না, তবে আজও সেই গ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বেশ দেখা যায় শুনেছি। দীপঙ্করের বাড়ি এখনও নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা নামে খ্যাত। এই দীপঙ্করের ভাইয়ের ছেলে দানশ্রী-র প্রাণের বন্ধু ছিলেন বিমল মিত্র ও জগৎ মিত্র নামে দুই ভাই। দু-জনেই প্রথমে হিন্দু হলেও পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে জাতিচ্যুত হন। বাবার মুখে শুনেছি, আমরা নাকি বিমল মিত্ররই বংশধর।

অনেক পরে রাজা কেদার রায়ের ঠিক আগে পরাক্রমশালী হিন্দু রাজা রঘুরাম রায়, তাঁর সেনাপতি রাম মালিকের সাহায্যে বিমল মিত্রর উত্তরপুরুষ সহ সব বৌদ্ধ প্রজাকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। রঘুরাম রায়ের নামে ছড়া প্রচলিত ছিল—

রাম মালিকের লাঠি<br>
রঘু রামের মাটি।<br>
উঠলে লাঠির ডাক।<br>
দৌড়ে পলায় বাঘ।<br>
মালিক ধরে লাঠি<br>
যম যেন সে খাঁটি।।

কিন্তু তবুও বৌদ্ধ তন্ত্র আর দেবদেবীর প্রভাব আমাদের পরিবারে চিরকালই ছিল। আমার মা তখনকার দিনের নামকরা মৃৎশিল্পী নিতাই পালের কাছে মাটির মূর্তি তৈরি করা শিখেছিলেন।

তাঁর বানানো বুদ্ধ আর প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি এখনও আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজনের কাছে আছে।

যা বলছিলাম, অতীশ দেশে ফেরার পর দানশ্রী-কে একটি মহামূল্য মূর্তি দান করেন। কিছুদিন তেলহারা মহাবিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গে এই যমন্তক মূর্তিটি থাকার পরে এটি আমাদের পরিবারে আসে। শোনা যায় এক অলৌকিক ঘটনায় মিত্র পরিবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণের সঙ্গেসঙ্গে এটি পরিবার থেকে উধাও হয়। একথাও শুনতে পাই, সুধারাম বাউল নামে এক বাউল নাকি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন মিত্র পরিবারের এক পুরুষই নাকি একে আবার উদ্ধার করবেন, যদিও বংশে তা আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না।

এবার কয়েকশো বছর এগিয়ে চলে আসি বিশ শতকের ঠিক আগে আগে। বিমল মিত্রর উত্তরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মিত্র ছিলেন ঘোর বৈষ্ণব। বাড়িতে রীতিমতো আখড়া খুলে খোল বাজিয়ে নামকীর্তন চলত অষ্টপ্রহর। তিনি বৈষ্ণব হলেও তাঁর ভাই নবকৃষ্ণ মনে মনে বৌদ্ধ ছিলেন, যদিও সমাজের ভয়ে কাউকে জানতে দিতেন না। একলা বন্ধ ঘরে তন্ত্র সাধনা করতেন বলেও জানা যায়। নবকৃষ্ণ ছিলেন আজকাল যাকে বলে 'পলিম্যাথ'। বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ ছিল তাঁর। মাথা পরিষ্কার। যেকোনো গাছ দেখেই চিনতে পারেন। হাতের লেখা নকলে বিশারদ। অল্প-বিস্তর ছবি আঁকতে পারেন, জাদু দেখাতে পারেন... হেঁয়ালি তাঁর প্রিয় বিষয়। কোথা থেকে যেন জোগাড় করে এনেছিলেন সংস্কৃত হেঁয়ালির বই *বিদগ্ধমুখমণ্ডলম্*-এর একটা হাতে-লেখা পুথি। এভাবেই হয়তো মিত্র বংশের চলে যেত, যদি না আচমকা একটা ঘটনা গোটা হিসেবটাই উলটেপালটে দিত...

মোটামুটি শান্তিতেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও নবকৃষ্ণ, দুই ভাই। শ্রীকৃষ্ণ বিয়ে করবেন না একরকম স্থির। কিন্তু বংশরক্ষা বড়ো দায়। তাই ভাইয়ের বয়স উনিশ পেরোতে-না-পেরোতে মেয়ের সন্ধান শুরু করলেন তিনি। মনোমতো মেয়ে আর পাওয়া যায় না। শেষে পাওয়া গেল সেই ময়মনসিংহের যশোদলে। এই যশোদলের জমিদারের জামাই রামসুন্দর দেব পরে মসূয়াতে ঘরবাড়ি করে বাস করতে থাকেন। এই রামেন্দ্রসুন্দরের দুই ছেলের মধ্যে একজনের শরিক পয়সাকড়ি করে আস্তে আস্তে ওই অঞ্চলের জমিদার হয়ে বসলেন। তাঁরা পদবি নিলেন রায়চৌধুরী। অন্য শরিকরা দেব উপাধিই রাখলেন। সেই দেব-দেরই একজন মহানাম দেবের কন্যা হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে নবকৃষ্ণর বিয়ে ঠিক হল। এই পরিবারেও কীর্তনের প্রচলন ছিল। অন্য শরিকের ছেলে রামকান্ত একবার খোল বাজিয়ে এমন গান গেয়েছিলেন যে খোল ফেটে চৌচির। রামকান্তর ছেলে লোকনাথ পেয়েছিলেন তন্ত্রসাধনার ধারা। একটা ডামর গ্রন্থ, একটা নরকপাল আর মহাশঙ্খের মালা নিয়ে দিনরাত সাধনা করতেন। নবকৃষ্ণর বিয়ের সময় অবশ্য ওই শরিকের মধ্যে থেকে লোকনাথের একমাত্র পুত্র কালীনাথের সঙ্গে তাঁর বড়োছেলে সারদারঞ্জনই এসেছিলেন। বিয়ের উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন দুটি খাঁটি সোনার গিনি। নবকৃষ্ণ কানাঘুসো শোনেন আরেক ছেলে কামদারঞ্জনকে নাকি কোনো এক কাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরী দত্তক নিয়ে নাম রেখেছেন উপেন্দ্রকিশোর। যে বছর নবকৃষ্ণর বিয়ে হয়, সেই একই বছর উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ব্রাহ্মসমাজের দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পক্ষের কন্যা বিধুমুখীর বিয়ে হয় এবং

তখনকার কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের বিপরীতে লাহাদের বাড়ির দোতলায় কয়েকটি ঘর ভাড়া নিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের সংসার জীবন শুরু হয়।

আবার ফিরে আসি নবকৃষ্ণর কথায়। বিয়ের পরে নবকৃষ্ণ আবার তন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। লোকে বলে লোকনাথের নরকপাল আর মহাশঙ্খর মালা নাকি তাঁর হস্তগত হয়েছিল। আর এসবের সাহায্যেই তিনি শুরু করলেন এমন এক সাধনা যা থেকে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। আনুমানিক দশম শতকে বজ্রযানেরই আরেক সাধনপন্থা হিসেবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আর একটি শাখা গড়ে ওঠে, যা কালচক্রযান নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা হলেন শ্রীকালচক্র। কালচক্রযানে অনেক ভয়ংকর ধরনের দেবদেবী বর্তমান যাঁদের মন্ত্র, মণ্ডল ও বলিদানের দ্বারা তৃপ্ত করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বহুবার ভাইকে বারণ করলেও শুনল না সে। বজ্রযান তখন বাংলা থেকে অস্তমিত। তবু তাঁদের এক গোপন সংগঠন রয়ে গেছিল সবার অজান্তে। সেই দলের সঙ্গে বিরোধ বাধল অচিরেই। বিয়ের কয়েকবছরের মধ্যেই হেমাঙ্গিনী একটি পুত্রের জন্ম দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার নাম রাখলেন হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণর যখন তিন বছর বয়স, বিপদ নেমে এল আচমকা। নিজের আখড়ায় গলার নলিকাটা অবস্থায় পাওয়া গেল শ্রীকৃষ্ণকে। তাঁর চারদিকে আগুনের দাগ, ধুনো, বজ্রচিহ্ন, চক্র আর অং লেখা। দেখেই মুখ-চোখ কঠিন হয়ে উঠল নবকৃষ্ণর। স্ত্রীকে বললেন,

'আর এখানে থাকন চলব না। বাসা বেইচ্যা পলাইতে হইব। অরা কাউরে ছাড়ব না।'

'কারা?'

'ওই বজ্রযানী গো দল। দাদারে মারসে, এবার হয় তোমারে, নয়, খোকারে মারব।'

কেঁদে ফেললেন হেমাঙ্গিনী। বাড়িঘর বেচে কোথায় যাবেন তাঁরা?

'ক্যান, ঢাকায়? ওখানে বাসা ভাড়া নিমু। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি বানায়া লইলেই হইব।'

'কে দিব তোমারে বাসাভাড়া?'

'দিব দিব। আমাগো গাঁ সম্বন্ধের উকিল সর্বেশ্বর বোসের

বাড়ি বানাইসে না ঢাকায়? উঠুম ওহানেই। তারপর ভগবান যা করেন। আর উকিলবাবুর পোলা সিদ্ধেশ্বর, হ্যাডা তো আমাগো খোকারই বয়সি।'

দিন পনেরো পরে ঘটিবাটি সব বেচে সপরিবার নবকৃষ্ণ চললেন ঢাকায়... পথের দেবতা প্রসন্ন হেসে বলেন— মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি...

## ২

ঢাকায় এসে প্রথমেই সর্বেশ্বর উকিলের বাড়িতে উঠলেন নবকৃষ্ণর পরিবার। দোতলা বাড়ি। একতলায় বেশ কিছু ঘর ফাঁকাই পড়ে ছিল। সেখানেই তিনজনায় থাকতেন। উকিলবাবুর বাড়িতে দেখার মতো ছিল তাঁর লাইব্রেরিটা। দেশ-বিদেশের এমন কোনো বই নেই যে তাঁর ছিল না। আরও একটা অদ্ভুত শখ ছিল তাঁর। তিন চার রকম খবরের কাগজ আসত বাড়িতে, সেখান থেকে নানা উত্তেজক খবর কেটে কেটে খাতায় সাঁটতেন। নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন বিলাতি 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিনের। সেখানে তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে শার্লক হোমস নামে এক গোয়েন্দার কীর্তিকলাপ। প্রায় যেন গিলতেন সেসব লেখা। তাঁর ছেলে সিদ্ধেশ্বর, সিধুর মধ্যেও এ নেশা পুরোদমে। দিনের বেশিরভাগ সময় সে তাঁর লাইব্রেরিতেই কাটায়। তাই সমবয়সি হওয়া সত্ত্বেও হরেকৃষ্ণের সঙ্গে তার দারুণ কিছু বন্ধুতা জমেনি। হরেকৃষ্ণ বরং ছোটো থেকেই জ্যাঠার মতো ঠাকুর দেবতা, নামগানের ভক্ত। সুযোগ পেলেই উদাসী হরেকৃষ্ণ হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন নবাবপুরের রাস্তা ধরে, ঘুরে বেড়াতেন রমনা

মহল্লায়, প্রায় সারাদিন কাটিয়ে দিতেন মালিবাগের সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে (এঁর নামেই নিজের ছেলের নাম দিয়েছিলেন সর্বেশ্বর)। এই মন্দিরে প্রায়ই খোল বাজিয়ে কীর্তন হত। সুগায়ক হওয়ায় ছোটো থেকেই সেখানে হরেকৃষ্ণর কদর ছিল। এই মন্দিরের চাতালেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় প্রায় সমবয়সি দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের। এই দুর্গামোহন পরে হরেকৃষ্ণর জীবনের মোড় বদলে দেবেন। কিন্তু সে-আলোচনা যথাসময়ে করা যাবে।

এদিকে নবকৃষ্ণর দিকে নজর দেওয়া যাক বরং। ঢাকায় এসে তিনি চাকরি খুঁজতে বাধ্য হন। তবে অঙ্কে তাঁর মাথা ছিল পরিষ্কার। ফলে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে কেরানির কাজ জুটিয়ে নিতে খুব কষ্ট হয়নি। তখন যে স্কুলটির সোনার দিন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৫ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের গোড়াপত্তন করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে মি রিজ নামে একজন দক্ষ ইংরেজ শিক্ষককে স্কুলের প্রথম প্রধানশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে প্রথমে এর নাম দেওয়া হয়েছিল ঢাকা ইংলিশ সেমিনারি। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে এই সেমিনারি থেকে ঢাকা কলেজ-এর জন্ম হয়। তখন স্কুল শাখাটির নাম রাখা হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত ইউরোপিয়ানদের দ্বারাই এই স্কুলটি পরিচালিত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম প্রধানশিক্ষকের পদ অর্জনের গৌরব লাভ করেন বাবু কৈলাস চন্দ্র ঘোষ। তবে বাবু রায়সাহেব রত্ন মণি গুপ্তর পরিচালনায় এ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর পর আট বছর বাংলা, বিহার ও আসাম প্রদেশের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে প্রথম স্থান অধিকার করার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জগদীশ বোস,

মেঘনাদ সাহারা এই স্কুলেরই ছাত্র। বছর দুয়েক ভাড়াবাড়িতে থাকার পর নবকৃষ্ণ নিজেই একখানি বাড়ি কিনলেন সেই পাড়াতেই। কারণ অবশ্য একটা আছে। পরিবার বাড়তে চলেছে। হেমাঙ্গিনী আবার সন্তানসম্ভবা। নতুন বাড়িতে আসার একমাসের মধ্যেই তাঁর দ্বিতীয় পুত্রর জন্ম হল। ১৯১৯ সালের সেই দিনটা ঐতিহাসিক। সেই ১৩ এপ্রিলই জেনারেল ও'ডায়ারের নির্দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হল ৩৭৯ জনকে, আহত হলেন ১২০০-রও বেশি মানুষ।

ছেলে হবার আনন্দ ঢেকে গেল এই দুঃসংবাদে। সরাসরি বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও মনেপ্রাণে দেশভক্ত নবকৃষ্ণ কিছুতেই মানতে পারছিলেন না এই ঘটনা। বিশ্বাস করতেন এ অবস্থা চিরকাল থাকতে পারে না। এ লড়াইতে ভারতীদের জয় নিশ্চিত। আর তাই যেন কতকটা আবিষ্ট হয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'এ পোলার নাম রাখুম জয়কৃষ্ণ।'

## ৩

জন্মে অবধি জয়কৃষ্ণ এক দুর্দান্ত বালক ছিলেন। খুব ছোটোবেলা থেকেই তার ডাকাবুকোপনায় লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। একবার, যখন সে পাঁচ বছরের মাত্র, এক হনুমান তার হাতের খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সে-বালক নাকি তৎক্ষণাৎ উলটে হনুমানকে মারে এক চাঁটি। ফলে পাড়ার আমলোভী হনুমানরাও নাকি তাকে এড়িয়ে চলত। তবে সবচেয়ে এড়িয়ে চলতেন দাদা হরেকৃষ্ণ। নিতান্ত শান্ত এই দাদাটির প্রতি ভাইয়ের অত্যাচারের সীমা ছিল না।

হরেকৃষ্ণ তখন কীর্তনের পাশাপাশি এক পশ্চিমা ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে ঠুংরি শিখছেন। ফৈয়াজ আলি নামে এক নামি গাইয়ে তাঁর গুরু। একদিন সন্ধের পর রাস্তা দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ফিরছেন, 'যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী।' ওয়াজেদ আলি শাহর লেখা এ গান হরেকৃষ্ণর বড়ো প্রিয়। হঠাৎ অন্ধকারে জঙ্গলে কিছু একটা নড়তে দেখলেন। একটা মানুষের মতো প্রাণী, কিন্তু আকারে খর্বকায়, কী নিয়ে যেন টানাটানির চেষ্টা চালাচ্ছে। সঙ্গে ছিলেন দুর্গামোহন। একটু ভীতু মানুষ। বললেন, 'ভাই হরে, কেমন একটা ইয়ে মনে হচ্ছে না?' তাঁর গানের শখ। কিন্তু গলা নেই। তবু এতক্ষণ অন্ধকারেই 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো' গাইবার চেষ্টায় ছিলেন। এবার সেটাও বন্ধ। ভাব দেখালেন কিছুই হয়নি, তবু বোঝাই গেল তাঁর তালু শুকিয়ে গেছে। হরেকৃষ্ণ পা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন। আর যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। দেখলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি তার এক বন্ধু সমেত একমনে শিয়ালের গর্তে হাত ঢুকিয়ে শিয়ালের বাচ্চা চুরিতে ব্যস্ত। হরেকৃষ্ণ 'কী করছিস রে!' বলে হাঁক দিতে দে দৌড়। নবকৃষ্ণ সচরাচর ছেলেদের মারধর করতেন না। কিন্তু সেদিন তিনিও সংযম হারালেন। জয়কৃষ্ণর দুষ্টুমিতে তার অভিন্নহৃদয় বন্ধুও ছিল দুইজন। একজন সর্বেশ্বর উকিলের কলিগ সত্যেন মজুমদারের ছেলে, রাজেন, রাজু; আর অন্যজন বিখ্যাত ভূত বিশেষজ্ঞ বরদাচরণের বন্ধু কেদার বাঁড়ুজ্যের ছেলে তারিণী। ভবতারিণীর কাছে মানত করে বৃদ্ধ বয়েসে এ সন্তান লাভ করেন কেদারবাবু। মজার ব্যাপার জয়কৃষ্ণ এবং তারিণী, দু-জনেরই জন্ম ১৯১৯ সালের একই দিনে।

হরেকৃষ্ণ এই সময় একটা চাকরি জোগাড় করেন। ময়মনসিংহর এক জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার। সেখানেই বিভিন্ন বন্দুকের সঙ্গে পরিচয় হয় হরেকৃষ্ণর। জমিদারবাবু তাঁর উৎসাহ দেখে তাঁকে নিজের থ্রি-সেভেন-ফাইভ বন্দুকটা চালাতে দিয়েছিলেন। অনেক পরে তাঁর ভাইয়ের ছেলেও যে একই মডেলের বন্দুকে তরাইয়ে বাঘ শিকার করবে, কে জানত! এই বন্দুক দিয়ে মধুপুরের জঙ্গলে বিস্তর বাঘ হরিণ বুনো শুয়োর শিকার করেছেন তিনি।

এদিকে কেদারবাবুরা ঢাকাতেই এক থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি গড়ে তোলেন। নবকৃষ্ণ তার সদস্যও হন। সদস্য হওয়ার পর থেকেই নবকৃষ্ণ কেমন বদলে যেতে থাকলেন। কাজে মন নেই। ভূত আর প্ল্যানচেটে একেবারে ডুবে গেলেন। আর এ ব্যাপারে তাঁর গুরু ছিলেন বিলাতের আর্থার কন্যান ডয়েল। শোনা যায় তিনি নাকি ডয়েলকে কী-একটা বিষয়ে চিঠি লিখে উত্তরও পেয়েছিলেন। সংসারের প্রতি উদাসীনতা বাড়তে থাকল। ফলে তিনি খেয়ালই করলেন না, তাঁর বড়োছেলে বহু রাতে ঘরে ফেরে না। কাটিয়ে দেয় শ্মশানে, কিংবা সাধুদের আখড়ায়। ছায়াসঙ্গীর মতো থাকেন দুর্গামোহন। জয়কৃষ্ণর বয়স যখন দশ, তখন হেমাঙ্গিনী তাঁর তৃতীয় সন্তানটি প্রসব করেন। ছেলের নাম রাখা হল বিনয়কৃষ্ণ। কিন্তু এই ছেলের জন্মের পর পরই এমন দুটি ভয়ানক ঘটনা ঘটে, যা মিত্র বংশের ইতিহাসের ধারাকে বদলে দিল চিরকালের মতো।

## ৪

বিনয়কৃষ্ণর জন্ম মিত্র বংশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আর তার জের এতটাই ছিল, যে চিরটাকাল তিনি (আমার বাবা) নিজেকে অপয়া বা পরিবারের ব্ল্যাক শিপ বলতেন। তাঁর জন্মের পর পরই নবকৃষ্ণ সংসার বিষয়ে প্রায় পুরোটাই উদাসীন হয়ে গেলেন। দিনরাত মেতে থাকতেন ভূত নিয়ে... ফলে যা হয়, চাকরিটি গেল। মেধাবী জয়কৃষ্ণ ছোটো থেকেই জলপানি পান, ফলে পড়ার খরচটুকু উঠলেও অন্য সব ব্যাপারে হাঁড়ির হাল। এ সময় প্রকৃত অভিভাবকের মতো দাঁড়ালেন সর্বেশ্বর উকিল। শুধু অর্থই নয়, নানা সুপরামর্শ দিয়ে তিনি পরিবারটাকে নষ্ট হতে দিলেন না। নবকৃষ্ণ রাতবিরেতে বেরিয়ে যেতেন। কোথায়, কেউ জানে না। রাতের পর রাত কাটাতেন পোড়োবাড়িতে... একা। একদিন বৈশাখ মাসের অমাবস্যা। সন্ধে থেকেই তুমুল কালবৈশাখী, আর শিলাবৃষ্টি। নবকৃষ্ণ বেরিয়ে গেলেন। হেমাঙ্গিনী শত বারণ করেও রাখতে পারলেন না তাঁকে। আর ফিরলেন না নবকৃষ্ণ। নদীর চরে এক শ্মশানের ধারে পরের দিন সকাল বেলায় বড়োছেলে হরেকৃষ্ণ বাবার মৃতদেহ খুঁজে পেল। খুব সম্ভব ধ্যান করতে করতে মারা গেছেন তিনি। একটা শিলার টুকরো ব্রহ্মতালুর ঠিক মাঝখানটা ভেদ করে করোটি চৌচির করে দিয়েছে। কোটিকে গুটিক এমন মৃত্যু হয়। দেখতে এসেছিলেন সবাই। ভূতসন্ধানী বড়দাও এসেছিলেন। কেদার বাঁড়ুজ্জে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন মৃত্যুর কথা আর কোথাও শুনেছ হে?'

—শুনেছি। বাবার মুখে। বাবা যখন গিরিডিতে ছিলেন, ওখানেই বটুকেশ্বর শঙ্কু নামে এক সাধকের ঠিক এভাবে মৃত্যু হয়েছিল।

—শঙ্কু? পদবিটা কেমন চেনা চেনা ঠেকছে?

—হ্যাঁ। ওঁর নাতি তো নামকরা অধ্যাপক। ত্রিলোকেশ্বর। স্কটিশ চার্চে পড়ায়...

এমন সব আলোচনা করতে করতে সবাই বাড়ি ফিরে এলেন। মজার ব্যাপার নবকৃষ্ণ নিজে ভূত বিশ্বাস করলেও বহুবার প্ল্যানচেট করা সত্ত্বেও নবকৃষ্ণর ভূত কোনোদিন আসেননি। নবকৃষ্ণর যেদিন মৃত্যু হল, তার ঠিক চার মাস পরে, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ (ইংরেজি ১৩ অগাস্ট, ১৯৩৪), ভদ্রেশ্বরে প্যারীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি শাঁখ বেজে উঠল। উলুধ্বনিতে ভরে উঠল সারা পাড়া। তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে। তবু তার মধ্যেই পাড়ার মেয়ে বউরা ভিড় করে এল। প্যারীচরণের দ্বিতীয় পুত্র কালীমোহনের এক পুত্রসন্তান হয়েছে। কুলপুরোহিত গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে নবজাতকের কোষ্ঠীর নাম দিলেন সর্বজ্ঞ। রাশি সিংহ। কিন্তু এ নামে তো আর ডাকা যায় না! নামকরণ অনুষ্ঠানের দিন প্রদীপের চারদিকে চারটি নাম লিখে রেখে দেওয়া হল। দেখা গেল ঠাকুরদা প্যারীচরণের দেওয়া নামটাই রয়ে গেছে। নাম রাখা হল লালমোহন।

বাবার মৃত্যুর পর হরেকৃষ্ণ চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলে এলেন। কিন্তু এলে কী হবে? সংসার নিয়ে তিনি বীতশ্রদ্ধ। দিনের পর দিন কোথায় থাকতেন কেউ জানত না। বিনয়ের বয়স এক পূর্ণ হবার আগেই তিনিও সংসার ত্যাগ করলেন। তাঁর কোনো খবর আর কেউ কোনোদিন জানেনি। যে দুর্গামোহন জানতে পারতেন, তাঁর সন্ধানেও লোক লাগালেন সর্বেশ্বর... কিন্তু কোনো মন্ত্রবলে তিনিও ভ্যানিশ হয়ে গেছেন। জয়কৃষ্ণ খবর নিয়ে জানলেন

খুলনার কমিশনার টার্নবুলের থুতনি গুলি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন দুর্গামোহন। তারপর থেকেই তিনি ফেরার। যাওয়ার আগে নিয়ে গেছেন পরিবারে বহুদিন ধরে সযত্নলালিত বহুমূল্য সোনার ওপর রত্নখচিত বালগোপালের এক লকেট। অনেক বছর পরে সেই গোপাল অবশ্য আবার তাঁর পরিবারে ফিরে এসেছিল, তাঁর ভাইপোর হাত ধরে।

আগেই বলেছি ছাত্র হিসেবে জয়কৃষ্ণ ছিলেন অসাধারণ। তবে অঙ্ক আর সংস্কৃতয় তাঁর মাথা খুলত দারুণরকম। প্রতিবার ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এই দুটি বিষয়ে সোনার মেডেল তাঁর বাঁধা। তবে দাদা কিংবা বাবার মতো আধ্যাত্মিক দিকে না গিয়ে তিনি মেতে থাকতেন শরীরচর্চায়। বিবেকানন্দকে গুরু বলে মানতেন, আর তাই বিশ্বাস করতেন গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলা ঢের ভালো। খুব ভোরে উঠে মুগুর ভাঁজতেন। ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার, কুস্তি... সবেতেই দুরন্ত। কাউকে না জানিয়ে তলায় তলায় যোগ দিয়েছিলেন অনুশীলন সমিতিতে। পুলিনবিহারী দাস তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন। ঠিক এই সময়ই জয়কৃষ্ণ মহা বিপদে পড়লেন।

৫

মাত্র ষোলো বছর বয়সে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে দলের হয়ে নানা গোপন কাজকর্ম করতেন জয়কৃষ্ণ। তাঁর এই গতিবিধি পরিবারের কেউ জানতেন না। তিরিশের দশক থেকে অনুশীলন সমিতিতে বামপন্থার অনুপ্রবেশ ঘটে। খুব সহজেই জয়কৃষ্ণ বামপন্থায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। মেধাবী জয়কৃষ্ণর কাজ ছিল নানা

গোপন ইস্তেহার বাংলায় অনুবাদ করা। আর এসব করতে গিয়েই জয়কৃষ্ণ পুলিশের নজরে পড়েন। তখন সদ্য তিনি ঢাকা কলেজ থেকে পাশ করেছেন। পুলিশের খোঁচড় পিছনে লাগল। ফলে চাকরি করা আর হল না তাঁর। তাঁকে যখন-তখন গ্রেপ্তার করা হতে পারে, এমন খবর প্রথমেই পেয়েছিলেন সর্বেশ্বর উকিল। তাঁর কথাতেই রাতারাতি জয়কৃষ্ণ পালিয়ে গেলেন সুদূর সাঁওতাল পরগনায়।

এই সাঁওতাল পরগনায় গমন জয়কৃষ্ণর জীবন বদলে দিল। বিদ্রোহ বিপ্লবের আঁচ সেখানে তেমন পৌঁছোয়নি। সেখানেই এক ছোটো প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন তিনি। এ চাকরিটিও পেলেন এক ভদ্রলোকের দয়াতে। আদিনাথ সোম এখানকার নামকরা অধ্যাপক। তাঁর দোতলা বাড়ি। প্রথম প্রথম তাঁর এক তলাতেই ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলেন জয়কৃষ্ণ। পরে স্কুলের পাশেই একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন। জয়কৃষ্ণর সাঁওতাল পরগনায় থাকার সময় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে।

একদিন তিনি পড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময় প্রেতাকৃতি একটি মানুষ তাঁর পথ জুড়ে দাঁড়ায়। তাঁর থেকে কিছু বড়ো হবে, দেহ কঙ্কালসার, আধময়লা ধুতি আর সুতির কামিজ। লোকটি তাঁকে দেখেই মুচকি হেসে বলে, 'কী মাস্টার, এক গণ্ডা পয়সা হবে নাকি?' জয়কৃষ্ণ তাঁকে দেখে বিরক্ত হলেও পকেট থেকে পয়সা বের করে দেন। লোকটি আবার বলে, 'এমনি নিচ্ছি ভেবো না যেন, পরে তোমার একখানি পোর্ট্রেট এঁকে শুধে দেব।' প্রথমে বিরক্তি ভাব থাকলেও পরে ফাল্গুনী পাল নামে এই শিল্পীর সঙ্গে জয়কৃষ্ণর বন্ধুতা গাঢ় হয়ে ওঠে। তবে ফাল্গুনী কথা রাখতে পারেনি। কিছুদিন পরেই কুয়োতে তার লাশ পাওয়া গেল। প্রাথমিকভাবে এই ঘটনা

জয়কৃষ্ণর ভেতর অবধি নাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে পরে শুনতে পায় কলকাতা নিবাসী কোন এক ব্যোমকেশ বক্সী নামের ভদ্রলোক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশবাবুকেই খুনি বলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি অবশ্য প্রণয়ঘটিত। এখানকারই ডাক্তার অশ্বিনী ঘটকের সঙ্গে এই ফাল্গুনীর হত্যা নিয়েই জয়কৃষ্ণর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। ডাক্তার ঘটক এই তরুণটিকে মনে মনে পছন্দ করতেন। তাঁর স্ত্রী রজনীর এক দূর সম্পর্কের বোন প্রমীলা বসুর সঙ্গে তিনি এই মেধাবী ছেলেটির বিয়ে ঠিক করেন। প্রমীলার নিকট আত্মীয় বলতে একজনই। তার সহোদরা পূর্ণিমা। দুই বোনের সংসার। প্রমীলার বাবা মা ছোটোবেলাতেই মারা গেছেন। রজনীরা তাই তাদের দেখভাল করেন। মায়ের সম্মতি নেওয়ার জন্য জয়কৃষ্ণ একবার ঢাকায় গেছিলেন, কিন্তু গোপনে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে প্রায় বিনা আড়ম্বরেই জয়কৃষ্ণ ও প্রমীলার শুভবিবাহ সম্পন্ন হল। কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন স্বয়ং ব্যোমকেশবাবু। সঙ্গে স্ত্রী সত্যবতী এবং বন্ধু অজিতবাবুও এসেছিলেন। ঢাকা থেকে এসেছিলেন সপুত্র কেদার বাঁড়ুজ্যে, সিদ্ধেশ্বর, মা হেমাঙ্গিনী ও ভাই বিনয়কৃষ্ণ।

৬

১৯৩৯ সাল ভারতের ইতিহাসে আর জয়কৃষ্ণর জীবনেও এক মোড় ঘোরানো বছর। সাঁওতাল পরগনায় থাকলেও দলের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যোগ ছিল তাঁর। শুনতে পাচ্ছিলেন কংগ্রেসে সুভাষপন্থী আর গান্ধীপন্থীদের মধ্যে আদর্শের লড়াই বেধেছে। তাই সুভাষবাবুর হাত শক্ত করতে বিয়ের একমাসের মধ্যে জয়কৃষ্ণ চললেন ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগ দিতে। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭

সালে পর পর দু-বছরের জন্য জওহরলাল নেহরুর জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচন ছিল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী শক্তির অগ্রগতির পরিচায়ক। সেই ধারা ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতি পদে নির্বাচনেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু গোল বাধল ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী (মধ্য প্রদেশ) কংগ্রেসে যখন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ গান্ধীজির ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল যাতে সুভাষচন্দ্রকে পুনরায় কংগ্রেস-সভাপতি পদে মনোনয়ন না দেওয়া হয়। ত্রিপুরী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষ বললেন, 'স্বরাজের লক্ষ্য চূড়ান্তভাবে এগিয়ে যাওয়ার এমন সোনার সুযোগ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আগে কখনো এসেছে কি? বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নিরিখে? সমগ্র পরিস্থিতিই তো আমাদের পক্ষে। তাই অত্যন্ত ঠান্ডামাথার বাস্তববাদী হিসেবে আমি মনে করছি, বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে এতটাই অনুকূল যে চূড়ান্ত আশাবাদী হতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়।'

সেখানেই প্রথমবার সুভাষ বোসের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি দেখা। সুভাষও পছন্দ করেছিলেন এই ঝকঝকে বুদ্ধিমান ছেলেটিকে। যখন ভোটাভুটিতে সুভাষ জিতলেন, তখন জয়কৃষ্ণ আনন্দে পাগলপারা হয়ে গেছিলেন যেন। জাতির জনক 'গান্ধীজি'-র একটি মন্তব্যে অবাক হয়েছিলেন তিনি। 'সীতারামাইয়ার পরাজয়, আমার পরাজয়।' স্বয়ং বাপুজির পরাজয়। নীতিগতভাবে বিভক্ত হয়ে যায় কংগ্রেস। সুভাষের জয় তাঁর মতো আরও এক বাঙালিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি আবেগের আতিশয্যে একটি কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন...

হে সুভাষ চন্দ্র
তোমাকে জিতিতে দেখে
মোর কী আনন্দ।
তুমি নেতা, তুমি গুরু
তুমি প্রিয়নাম
তোমাকে সবাই মিলে
করিব প্রণাম।

এই ছেলেটিও জয়কৃষ্ণরই বয়সি। বাড়ি চুঁচুড়ায়। এমনিতে বৈকুণ্ঠ মল্লিক নামের ছেলেটি খারাপ নয়, কিন্তু তার কবিতা লেখার ভয়ানক শখ। আর শখ জনে জনে সে-কবিতা পড়ানোর। ফলে একে দেখলেই জয়কৃষ্ণ দ্রুত পালাবার পথ খুঁজতেন। ফিরে এসে জয়কৃষ্ণ মনেপ্রাণে সুভাষপন্থী হয়ে পড়েন। অনেক পরে সুভাষ যখন ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন, তাতে প্রথম যে ক-জন যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন জয়কৃষ্ণ, অন্যজন বৈকুণ্ঠ।

এদিকে বিয়ের পর পরই প্রমীলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। কাছাকাছি কোনো আত্মীয় নেই, রজনী ও ডাক্তার ঘটক তখন বিদেশে, তাই প্রমীলাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়, হেমাঙ্গিনীর কাছে। জয়কৃষ্ণ নিজে প্রায়ই চলে যেতেন কলকাতায়, দেশের কাজে। কলকাতার কাছেই ঘুঘুডাঙা নামে এক জায়গায় মেসবাড়ি ভাড়া করে থাকতে লাগলেন তিনি। স্থানটি উঁচু। এই উঁচুভূমি বা টিলাকে স্থানীয় লোকেরা দমদমা বলে। সম্প্রতি সেখানে একটি জংশন স্টেশনও চালু হয়েছিল। জয়কৃষ্ণর মেসটি স্টেশনের পাশে। রোজ সকালে ট্রেনের বাঁশি শুনে ঘুম ভাঙে। মাঝে মাঝে তারিণী আসে। থেকে যায়। আবার কোথায় গায়েব হয়ে যায়,

কেউ জানে না। তার থেকেই জয়কৃষ্ণ দেশের খবর নেন। সর্বেশ্বর উকিলরা নাকি ঢাকার বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে সর্দার শঙ্কর রোডে বাড়ি কিনছেন, ভূতসন্ধানী বরদা বেশ কিছুদিন নিরুদ্দেশ... এমন সব খবর। তারিণীর কাছেই একদিন জয়কৃষ্ণ খবর পেলেন প্রমীলা আসন্নপ্রসবা। তাঁর একবার ঢাকা যাওয়া অবশ্যই উচিত। সব জেনেও যাওয়া হল না জয়কৃষ্ণর। কলকাতায় সুভাষবাবু তাঁকে নানা কাজ দিয়েছেন। আর ঢাকাতে পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। তাই মন চাইলেও যাওয়া হল না।

সময়টা ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাস। বেশ কিছুদিন ধরেই জয়কৃষ্ণ বেশ চিন্তিত। প্রমীলার প্রসবের সময় আসন্ন, এদিকে অনেকদিন কোনো খবর নেই। তারিণীও আসছে না। প্রায়ই চাপা উত্তেজনায় বাঁ-হাতের তেলোর চাপে ডান হাতের আঙুল মটকায়, ঘন ঘন পায়চারি করে। বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে সিলিং-এর দিকে। কপালে চিন্তার চারটে ঢেউ খেলানো দাগ। সেদিন অবশ্য তাঁর মেসে হইহই ব্যাপার। সুভাষবাবু নিজে এসেছেন তাঁর মেসে, কিছু বন্ধুবান্ধব সমেত। সঙ্গে এনেছেন এক চাঙারি ভীম নাগের নতুন গুড়ের সন্দেশ। এই একটি জিনিস বড্ড ভালোবাসেন জয়কৃষ্ণ। নানা কথার মধ্যেও জয়কৃষ্ণ যেন একটু আনমনা। সুভাষবাবু বলছিলেন 'একমাত্র দেশের জন্য রক্ত দিলেই দেশ স্বাধীনতা পাবে। অন্য কোনোভাবে নয়। আমাদের এই দেশকে স্বপ্নের দেশ, সোনার দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে...'

এমন সময় ডাকপিয়োন কড়া নাড়ল। ছুটে গিয়ে জয়কৃষ্ণ নিলেন তাঁর নামে আসা টেলিগ্রামটি। জয়কৃষ্ণর চিন্তার কথা সুভাষ জানতেন।

জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার, জয়? চিন্তার কিছু নেই তো?’

মুচকি হাসলেন জয়কৃষ্ণ, ‘ওদিকেও সোনা। ছেলে হয়েছে।’

৭

এখানে একটু অন্য কথা বলি বরং। আর একজনের কথা। যাঁর কথা না বললে এই নোটবুক সম্পূর্ণ হবে না। ঢাকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ললিতমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঠিক করলেন সপরিবার কলকাতা গমন করবেন। মন ভালো নেই। ছোটোনাতি ফেরার।  তখন কলকাতা সবে গড়ে উঠছে। নেহাত দায়ে না পড়লে কেউ কলকাতা যায় না। পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। একটু বেশিদিন থাকলেই গায়ে সাদা সাদা খড়ি ওঠে। পেটের রোগ ধরে যায়। এখানকার লোকেরা বলে নোনা ধরা। তাই কলকাতার অদূরে  হুগলির ভদ্রেশ্বরে বিশাল বাড়ি বানালেন ললিতমোহন। তবে ভোগ করতে পারলেন না। বাড়িতে তিনমাস থেকেই অতিসার রোগে তাঁর মৃত্যু হল।

হুগলিতে এসেই কাগজের ব্যাবসা শুরু করেছিলেন তিনি। ছেলে প্যারীমোহন বাবার ব্যাবসার হাল ধরলেন। প্যারীমোহনের হাতে সোনা ফলল। কাগজের ব্যাবসায় ক্রমে ধনী হয়ে উঠলেন তাঁরা। কলকাতায় নিয়মিত যাতায়াত বাড়ল প্যারীমোহনের। মাত্র দুই তিন বছরে উঠতি ধনীদের মধ্যে গণ্য হলেন তিনি। প্যারীমোহনের চেহারাটাও ছিল দেখার মতো। মাথায় পাগড়ি, হাতে ছড়ি আর পকেটে কুক কেলভির চেনটানা পকেটঘড়ি নিয়ে যখন জুড়িগাড়িতে যেতেন, রীতিমতো কেউকেটা লাগত তাঁকে। এই ঘড়িটাই পরে ফেলুদার হাতে এসেছিল। সে-কাহিনি অনেকের জানা।

প্যারীমোহনের বড়োছেলে মোহিনীমোহন হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তারি পড়তেন ক্যালকাটা হোমিয়োপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে। পাশ করে ভদ্রেশ্বরেই ডাক্তার হয়ে বসলেন। দারুণ হাতযশ। তিনি ব্যাবসায় আসবেন না। ফলে পারিবারিক ব্যাবসার ধারা বয়ে নিয়ে চললেন মেজো কালীমোহন। কালীমোহনের স্ত্রী ভবতারিণী ও কন্যা বরুণা। তাঁর শ্বশুরমশাই হরিমোহন গাঙ্গুলি ছিলেন বিখ্যাত গাইয়ে। তখনকার দিনে বিখ্যাত ওস্তাদদের মধ্যে তাঁকে ধরা হত। তাঁর গাওয়া খান ত্রিশেক ওস্তাদি গানের লং প্লে রেকর্ডও বার করেছিল এইচ এম ভি আর কলম্বিয়া।

লালমোহনের জন্মের কিছুদিন পরেই প্যারীমোহন মারা যান। এদিকে কলকাতায় কাজ বেড়ে যাওয়াতে গোটা পরিবার কলকাতায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। লালমোহনের যখন সাড়ে তিন বছর, তখন গাঙ্গুলি পরিবার গড়পারে বাড়ি নিয়ে উঠে আসে। ছোট্ট লালুকে নিয়ে বাবা দেখাতেন গড়পার রোডের সেই বাড়িটা যেখানে একদিন ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এর বাড়ি ছিল। বাবার কাছেই লালু শোনে হারিয়ে যাওয়া 'সন্দেশ' পত্রিকার কথা, সুকুমার রায়ের গল্প। শুনতে পায় সুকুমারের নাকি এক ছেলে আছে। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টে পড়ে। নাম মানিক।

ছোটো থেকেই লালুর ইচ্ছে ছিল লেখক হওয়ার। ঠাকুমার কোলে বসে শুনতেন রামায়ণের কাহিনি। শুনে শুনে রামায়ণের অনেকটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছিল তাঁর। রাবণ যে দৃশ্যে সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, আর জটায়ু এসে বাঁচাচ্ছে তাঁকে, সেই দৃশ্য এলেই তাঁর রোম খাড়া হয়ে যেত। বার বার ঠাকুমাকে

বলতেন, 'ঠাকুমা, আবার শোনাও।' সেই থেকে লালুর হিরো রাম নয়, জটায়ু। পরে অবশ্য রাজা রবি বর্মার আঁকা সীতাহরণের ছবি দেখে সে বীরপুজো বেড়েছিল বই কমেনি। বাবা বলতেন, 'আগে শরীর গড়ো।' উত্তর কলকাতার সুরেশ মল্লিক স্ট্রিটে এক ব্যায়ামাগারে কৈশোরেই ভরতি করে দেন লালুকে। সকালে উঠে খালি পেটে খেতেই হত এক কোয়া রসুন। মায়ের গড়ন পাওয়া লালু আকারে ছোটো। খুব ইচ্ছে লম্বা হওয়ার। কিন্তু পর্দার ছত্রি ধরে ঝুলতে গিয়ে উলটে পড়ে এমন নাকাল হয়েছিলেন, সে-চেষ্টা আর করতেন না। তবে যে দুটো জিনিস দারুণ পারতেন, তার একটা হল সাঁতার আর অন্যটা দৌড়। সাঁতার কাটতেন হেদোয়, নিয়মিত। তাঁর বাটারফ্লাই স্ট্রোক দেখে লোকে ক্ল্যাপও দিয়েছে। দেখতে ছোটোখাটো রোগাভোগা হলেও পাঁই পাঁই করে ছুটতে আর গাছ বাইতে তাঁর জুড়ি ছিল না। একবার লোয়ার সার্কুলার রোডের এক পাগল তাঁকে তাড়া করেছিল। সে-পাগল এমনিতে ট্রাম বাস লক্ষ করে ঢিল ছুড়ত। একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেটাই দেখছিল লালু। হঠাৎ কী হল কে জানে, সে-পাগল একটা আধলা ইট নিয়ে 'মজা দেখবি? মজা দেখবি?' বলে লালুর দিকে তেড়ে এল। নেহাত লালু দারুণ দৌড়োতে পারত, তাই রক্ষে। নইলে সেদিন একটা অঘটন ঘটেই যেত। তারপর থেকে বড়ো হয়েও পাগল দেখলেই লালমোহন কেমন গুটিয়ে যেতেন।

একটু বড়ো হলে তাঁকে ভরতি করে দেওয়া হল এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশনে। জয়কৃষ্ণর সেই কবিবন্ধু বৈকুণ্ঠ মল্লিক তখন এথেনিয়ামের মাস্টার। এই মানুষটির প্রভাব কিশোর

লালমোহনের ওপর যতটা পড়েছিল, তেমনটা আর হয়নি। ভ্রমণপিপাসু বৈকুণ্ঠ সময় পেলেই বেরিয়ে পড়তেন তীর্থ ভ্রমণে। ফিরে এসে ক্লাসে সেসব গল্প করতেন ছাত্রদের। কোথাও গেলেই সেই জায়গা নিয়ে কবিতা লেখা চাই-ই। রাজস্থান, ইলোরা, পুরী... সব জায়গা ঘোরা ছিল তাঁর। লালমোহনের মধ্যে ঘোরার বাতিক আর লেখার বাতিক তিনিই ঢুকিয়েছিলেন। প্রায় বীরপূজার মতো পূজা করত তাঁকে শিশু লালু। বাংলা বাদে ভূগোলেরও ক্লাস নিতেন বৈকুণ্ঠ মল্লিক। একদিন আফ্রিকার গল্প

বলতে বলতে আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'বল দেখি, আফ্রিকায় কী কী জন্তু পাওয়া যায়?'

লালু হাত উঠিয়েই উত্তর দিল, 'সিংহ, হাতি, নেকড়ে...'

হেসে ফেললেন বৈকুণ্ঠ। ছাত্রদের বকাঝকা একদম পছন্দ করতেন না। লালুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'একটা কথা বলি, মনে গেঁথে নাও বাছা, আফ্রিকায় নেকড়ে নেই। থাকতে পারে না।'

লালমোহনের মধ্যে যে অভিনয়ের প্রতিভাও আছে, সেটা অবশ্য প্রথম লক্ষ করেন এথেনিয়ামের অন্য এক মাস্টারমশাই তুলসীচরণ দাশগুপ্ত। তাঁর আদি বাড়ি গোঁসাইপুরে। লালুর মধ্যে একটা স্বাভাবিক কমেডি টাইমিং আছে, সেটা তিনিই প্রথম খেয়াল করলেন। বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন গড়পারেই। একবার পাড়ার থিয়েটারে তিনি পরিচালক হলেন। নাটক হবে পরশুরামের 'ভূশণ্ডির মাঠ'। সব চরিত্র রেডি, শুধু নাদু মল্লিকের উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তুলসীবাবুই প্রথম লালুর কথা ভাবেন। রিহার্সালের সময়ই বোঝা গেল, এ ছেলের হবে। উচ্চারণে 'র' আর 'ড়' নিয়ে সামান্য সমস্যা আছে বটে, কিন্তু অভিনয় তুখোড়। যেভাবে সে 'ধিন তা ধিনা কত্তা গে/ গিন্নী ঘা দেন কর্তাকে' বললে তাতে সবাই হেসে কুটিপাটি। সেবার পাড়ার থিয়েটার দারুণ জমল।

পাড়ায় লালুর বন্ধু বলতে পুলক চ্যাটার্জি আর সোমেশ্বর হাজরা। সোমেশ্বরের ব্যায়ামের বাতিক। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে লালু। দু-একবার হারিয়েও দেয়। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যেও দু-জন ছিলেন বিশেষ ঘনিষ্ঠ, শতদল সেন আর হৃষীকেশ চৌধুরী। একবার এই শতদল ক্লাসে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে

টিফিনে কী যেন পড়ছিল। লালু বললে, 'কী পড়ছিস রে? দেখা...'

'না দেখাব না, তাহলে তুই বৈকুণ্ঠবাবুকে বলে দিবি।'

'দেব না, সত্যি বলছি... বল না ভাই কী পড়ছিস?'

শতদল চুপি চুপি কোঁচড় থেকে বের করলেন খবরের কাগজ মোড়া একটা বই। নাম 'হত্যাকারী কে?'... লেখকের নামটাও দেখে নিল লালু। পাঁচকড়ি দে। অনেক বলে-কয়ে একরাতের জন্য বই ধার নিয়ে গেল। সারারাত জেগে কাঁপা কাঁপা মোমের আলোয় শেষও করে ফেলল। বাবা মা ভেবেছিলেন সামনে পরীক্ষার পড়া বুঝি। পড়া যখন শেষ হল, তখন প্রায় ভোররাত। খাটে বসে বিড়বিড় করে লালু বলল, 'আমাকেও এরকম গপ্প লিখতে হবে।'

৮

ওদিকে জয়কৃষ্ণর কী হল দেখা যাক। জয়কৃষ্ণ চাইলেও ঢাকায় যেতে পারলেন না। পুলিশের খোঁচড় তাঁর জন্য ওত পেতে বসে আছে। সুভাষবাবু দু-একবার অনুরোধ করেননি তা নয়। তবে জয়কৃষ্ণ বিপদে পা বাড়াতে নারাজ। দিন পনেরো বাদে মেসে ফিরেই চমকে উঠলেন জয়কৃষ্ণ। তারিণী এসেছে। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তার! চোখ লাল, গর্তে বসা, যেন অনেকদিন ঘুমোয়নি। একটা কালো আলোয়ান গায়ে দরজার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই জয়কৃষ্ণর মন কু গাইল। ছেলের কিছু হয়নি তো! জিজ্ঞেস করতেই বিড়বিড় করে তারিণী বললে, 'ছেলে ভালো আছে... প্রমীলা...'

—কী হয়েছে প্রমীলার?

—তোকে বলা হয়নি। ছেলে পেটে থাকা অবস্থাতে মাঝে মাঝেই ওর শরীর খারাপ হত। আমরা কবিরাজ কাকাকে দেখিয়ে আনতাম। কিন্তু ছেলে হবার পর প্রচণ্ড জ্বর এল। কবিরাজ বললেন সূতিকার জ্বর... সেরে যাবে। তিনদিন সেই জ্বরে ভুগে প্রমীলা...'

তারিণী কথা শেষ করার আগেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন। জয়কৃষ্ণর মাথা কাজ করছিল না। তারিণীর কান্নাই সব বলে দিচ্ছে। প্রচণ্ড এক রাগের বশে তিনি সপাটে এক চড় মেরে বসলেন তারিণীর গালে। তারপর দু-জনে মিলে গলা জড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে বসলেন।

ঘণ্টাখানেক পর তারিণী বললে, 'তুই দেশে চল। সুভাষবাবু মানা করবেন না। আমি কথা বলেছি। ছেলে হল, আর সে-ছেলের মুখ দেখবি না?' কেন যেন জয়কৃষ্ণর মনে হচ্ছিল এ ছেলে না হলেই হয়তো ভালো হত। প্রমীলাকে হারাতে হত না। তবু হাজার হোক সন্তান। জয়কৃষ্ণ রাজি হলেন। পুলিশের ভয় সত্ত্বেও দেশের বাড়ি ফিরলেন। ছেলেকে এতদিন পরে দেখে হেমাঙ্গিনীর চোখের জল বাঁধ মানল না। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন। শেষে ভিতর ঘর থেকে ছোট্ট পোঁটলামতো কী-একটা এনে জয়কৃষ্ণর কোলে ফেলে দিয়ে বললে, 'এই নে বাবা। তর পোলা।'

জয়কৃষ্ণ ছেলের মুখ দেখে চোখ ফেরাতে পারলেন না। মায়ের মতো ফর্সা, টানা চোখ, টিকোলো নাক। আর এ শিশুর হাতের মুঠি অন্য শিশুদের মতো বন্ধ নয়। খোলা। যেন নিতে না, সব কিছু উজাড় করে দিতে এর জন্ম হয়েছে। ছেলের মধ্যে যেন

হারানো প্রমীলাকে খুঁজে পেলেন জয়কৃষ্ণ। 'কবে যেন হল?' মাকে জিজ্ঞেস করলেন জয়। 'এই তো, আশ্বিনের পাঁচই। পূর্ণিমার দিন। সন্ধ্যাবেলা।' অনেকক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে জয় যখন মুখ ওঠালেন তখন ঠোঁটের কোনায় পরিচিত একপেশে হাসিটা ফিরে এসেছে। গত চারদিনে এই প্রথমবার। কোলের পুঁটুলিটা মায়ের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'ছেলের নাম রেখো প্রদোষ চন্দ্র।'

৯

ছেলের জন্মই হোক, কিংবা স্ত্রীর মৃত্যু, জয়কৃষ্ণর মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। ধীরে ধীরে বিপ্লবী দলের সঙ্গে তিনি দূরত্ব বাড়াতে লাগলেন। গোপন সভাসমিতিতে আর যেতেন না। তাঁর ছেলের সঙ্গেই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটত। এদিকে ভাই বড়ো হচ্ছে, ছেলেরও খরচ আছে। চাকরি না নিলেই নয়। অগত্যা ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার জন্য দরবার করলেন। তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও পুলিশের খাতায় নাম থাকা একজনকে নিতে স্কুলের কর্তৃপক্ষের বিস্তর আপত্তি ছিল। শেষমেষ প্রিন্সিপাল ওডেন সাহেব নিজে তদবির করলেন। সিদ্ধান্ত হল জয়কৃষ্ণ যদি মুচলেকা দেন, তিনি কোনোদিন বিপ্লবীদের ছায়াও মাড়াবেন না, তবেই তিনি চাকরি পেতে পারেন। সংসার বড়ো বালাই। জয়কৃষ্ণ রাজি হলেন। অঙ্ক আর সংস্কৃতর শিক্ষক হিসেবে ১৯৪০-এর অগাস্টে যোগ দিলেন ঢাকা কলেজিয়েটে।

জয়কৃষ্ণর মা-মরা ছেলে বড়ো হতে লাগল। বাবা বিশেষ সময় দিতে পারেন না। তাই কাকার সঙ্গেই তার যত খেলা।

মাত্র নয় মাস বয়েসেই কথা ফুটেছিল ছেলেটির। আর ছিল আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। ঠাকুমার পাঠ শুনে শুনে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছিল তার। যেকোনো ছড়া দু-একবার শুনলেই ঝরঝর করে বলতে পারে। খেলে বেড়ায় গ্রামের মাঠে, কাকার সঙ্গে। বাবা কাকার মতো তারও ছোটো থেকেই ভোরে ওঠার অভ্যাস। গ্রামে যাত্রা দেখে এসে অনেক রাত করে ঘুমোলেও সকালে সূর্য ওঠার আগেই সবাই উঠে পড়েন। ছেলেটির ঘুম বড়ো পাতলা। এক ডাকেই উঠে যায়। উঠেই জয়কৃষ্ণ সোজা ছাদে নিয়ে যান তাকে। টানা কুড়িবার ওঠবোস করতে হয়। জয়কৃষ্ণ নিজেও ব্যায়াম করেন। অনুশীলন সমিতির এই স্বভাব আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে ছিল। কাকা তাকে গাছ চেনায়। সে অবাক চোখে দেখে গাঁয়ের মাঠে শীতকালে সকাল সন্ধ্যায় জমে থাকে অদ্ভুত এক ধোঁয়া, গাছগুলোর গুঁড়ি আর মাথার ওপরটা খালি দেখা যায়। আর সন্ধ্যাটা নামে ঝপ করে। আর তারপরেই কনকনে ঠান্ডা। কাকার কাছেই তার হারমোনিয়ামের হাতেখড়ি। কাকা হাতে ধরে শেখান, 'এই দেখ, এই সাতটা হল বিশুদ্ধ স্বর... এই যে কোমল "নি", এই যে কড়ি "মা"...।' বাবা বাড়ি ফিরেই বেরিয়ে যান টিউশনি করতে। যদি সময় হয়, ছেলেকে গল্প শোনান। বিপ্লবীদের কথা, দেশ-বিদেশের অদ্ভুত সব ঘটনা। মাঝে মাঝেই তাক থেকে নামিয়ে নেন সুকুমারের *আবোল তাবোল*। বাপ ছেলে সুর করে একসঙ্গে পড়ে 'আয়রে ভোলা, খেয়াল খোলা স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়' কিংবা ছেলের জন্য নতুন খেলনা নিয়ে এসে বাবা হাঁকেন, 'বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু/ আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।' ছেলে

আধো আধো গলায় বলে, 'আজকে হেথায় চাম্‌চিকে আর পেঁচারা/ আসবে সবাই মরবে ইঁদুর বেচারা।' সেখান থেকে উঠে ঠাকুমার কাছে পাঠ শোনা... হেমাঙ্গিনীর শরীর বিশেষ ভালো নয়। তবু তিনি গুনগুন করে পড়ে যান। মাঝে মাঝে চিবোতে থাকেন দু-এক খিলি পান। মাদ্রাজি সুপুরি দিয়ে। এই সুপুরি তাঁর নাতিরও বড়ো প্রিয়। নাতির মুখেও প্রায়ই তিনি গুঁজে দেন খয়ের ছাড়া মিঠে পান। খেতেও বড্ড ভালোবাসে ছেলেটা। হেমাঙ্গিনী তার জন্য রাঁধেন ধবধবে সাদা ভাত, সোনা মুগের ডাল, পাঁপড়। শেষপাতে দই আর শীতে কড়া পাকের সন্দেশ। বর্ষার দুপুরে খিচুড়ি ডিমভাজা জমিয়ে খান সবাই মিলে। তবে বড়ো মায়া হয়। এ ছেলের কত যত্নে, কত আদরে মানুষ হওয়ার কথা... সে-যত্ন করতে পারেন কই? আহা রে! যদি এর মা থাকত। ফেলে দেওয়া হিরের টুকরোর মতো নাতিকে হেমাঙ্গিনী তাই ডাকেন 'ফেলু' বলে।

## ১০

গ্রামের পাঠশালাতেই পড়াশুনো শুরু হল ফেলুর। যেমন হয়। কিন্তু সে-সুখ বেশিদিন সইল না ফেলুর কপালে। কাকা বিনয়কৃষ্ণ তখন সবে কলকাতায় পড়তে গেছে। স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেখানকার অধ্যাপক ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর প্রিয় ছাত্র সে। হিন্দু হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে।

ফেলুর সবচেয়ে কাছের মানুষ আর চোখের সামনে নেই।

বন্ধু বলতে সাহা বাড়ির সোমেশ্বর। আর এর মধ্যেই চলে এল ১৯৪৭ সাল। ভারত স্বাধীন হল। দলে দলে উদ্‌বাস্তু পাড়ি দিতে লাগলেন ভারতের পথে। দ্যাশের বাড়ি ছেড়ে, নিজের দেশে, নতুন দেশে। অদ্ভুত দোলাচলে পড়লেন জয়কৃষ্ণ। কী করবেন? দেশ ছেড়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দেবেন, না থেকে যাবেন দেশের বাড়ি আঁকড়ে? অনেক ভেবে দ্বিতীয়টাই ঠিক করলেন। কিন্তু জয়কৃষ্ণর এক গোপন জীবন ছিল। এই জীবনের কথা প্রায় কেউ জানতেন না। ফেলু না, তাঁর মা না, তাঁর ভাই না। বংশের রক্ত ধীরে ধীরে তাঁর রং দেখাচ্ছিল। বাবার পথ ধরে জয়কৃষ্ণও মিশতে শুরু করলেন বজ্রযোগিনীর তান্ত্রিকদের সঙ্গে। যেতে থাকলেন তাঁদের গোপন আখড়ায়। বাড়ির পুরোনো তোরঙ্গ খুলে পেলেন তাঁর বাবার তৈরি কালচক্র, তান্ত্রিক ছক। সংসার থেকে দূরত্ব বাড়তে লাগল। ফেলু বার বার বাবার কাছে এসে ঘুরে যায়। বাবা যেন ঘোরের মধ্যে থাকেন। হেমাঙ্গিনী আচমকা সন্ন্যাস রোগে মারা গেলে অবস্থা আরও করুণ হল। বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে জয়কৃষ্ণ ঘরেই প্ল্যানচেটের আসর বসাতে থাকলেন রাতের পর রাত। খবর পেয়ে ছোটোভাই এলেন। কিন্তু তাঁর কথাতেও কোনো কাজ হল না। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের এক বর্ষার সকালে ফেলু তার বাবার ঘরে ঢুকে বাবাকে মৃত অবস্থায় পেল। কে বা কারা যেন গলা টিপে মেরে রেখে গেছে জয়কৃষ্ণকে। চারিদিকে ছড়ানো মড়ার খুলি, হাড়গোড়। পুলিশ, গোয়েন্দা কেউ এই খুনের কিনারা করতে পারেনি।

পড়াশুনো আর চালানো হল না বিনয়কৃষ্ণর। সওদাগরি অফিসে চাকরি নিলেন। যোগাযোগ করিয়ে দিলেন সর্বেশ্বর

উকিলই। চাকরি পেয়েই ঢাকার সম্পত্তি বেচে, ফেলুকে নিয়ে এসে কলকাতায় তারা রোডে বাসা ভাড়া করেন। কাকা ভাইপোর সে-সংসারে মাঝে মাঝেই এসে থেকে যেতেন তারিণী। তারিণী এলেই ফেলুর মন ভালো হয়ে যেত। রেগুলার চাকরি যাকে বলে তা কোনোদিন করেননি তিনি। সেবার যখন এলেন, ফিফটি ওয়ানে, তখন নাকি লখনৌতে থাকেন, লাটুশ রোডে ছোট্ট একটা বাংলো ভাড়া করে। 'পায়োনিয়ার' কাগজে ইংরেজি চুটকি গোছের লেখা লেখেন আর মাঝেমধ্যে হজরতগঞ্জের একটা নিলামের দোকানে যান। সেখানেই জোসেফ ম্যান্টনের ছাপওয়ালা একজোড়া ডুয়েল বন্দুক নিয়ে কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর, তাই শোনাচ্ছিলেন ফেলুকে। হাতে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ি আর সামনে চিনি ছাড়া লাল চা। ফেলু হাঁ করে সেসব গল্প শোনে। নানা বিষয়ে ফেলুর আগ্রহ দেখার মতো। তারা রোড থেকে বিকেলে রোজ হেঁটে হেঁটে যায় সর্দার শঙ্কর রোডে। সিদ্ধেশ্বর বোসের বাড়ির লাইব্রেরিতে। কত বিচিত্র সব বই। কত বিচিত্র বিষয়। সময় যে কীভাবে কেটে যায় ফেলু বুঝতেই পারে না। সেখানেই প্রথমবার ফেলুর চোখ পড়ল সবুজ মলাটে মোড়া একটা বইয়ের ওপর। পাতা ওলটাতেই যে লাইনগুলো দেখতে পেল, সেগুলো এইরকম, 'হেমন্তের অপরাহ্নের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তপর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, মূর্তিমতী বনদেবীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি— কৃষ্ণা বনদেবী। রাজকুমারী তো ও বটেই! এই বনাঞ্চল, পাহাড়, ওই মিছি নদী, কারো নদীর উপত্যকা, এদিকে ধনঝরি ওদিকে নওয়াদার

শৈলশ্রেণী— এই সমস্ত স্থান একসময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই রাজবংশের মেয়ে— আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্যস্ত, দরিদ্র, প্রভাবহীন— তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মতো। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।'

এ কেমন বই? এ কেমন ভাষা? আগে তো কোনোদিন এমন বই পড়েনি সে... দেখল নাম লেখা আছে, 'আরণ্যক'। লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেমন করে যেন এই বই তার মনে গেঁথে গেল চিরদিনের মতো। কতবার সে এ বই পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। চিরকাল এই বই ওর পছন্দের সেরা বই হয়েই থেকেছিল। সিধুজ্যাঠার বাড়িতে বসে সে পড়ে আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস আর চ্যালেঞ্জারের গল্প, জিম করবেট, কেনেথ অ্যান্ডারসনের শিকারের কাহিনি। তাঁর তিন আলমারি বইয়ের মধ্যে দেড় আলমারি হল আর্টের বই। জোড়া গির্জের নির্মল কুমারের থেকে সংগ্রহ করা। ফেলু উলটেপালটে দেখে রাজপুত পেন্টিং, টিনটোরেটো, জেত্তো, মান্তেন্নার আঁকা ছবির রঙিন প্রিন্ট। সিধুজ্যাঠা আদর করে ওকে ডাকেন ফেলুচাঁদ।

সিধুজ্যাঠার খুব বইয়ের বাতিক। সেটা বাদ দিলে দাবা খেলা আর খাওয়া নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট তাঁর শখ। ফেলু তাঁর কাছে এলে প্রায়ই দইয়ের সঙ্গে অমলেট মেখে খাওয়ান। অপছন্দ হলেও বলতে পারে না ফেলু। এই জ্যাঠা তাঁর চিরকালের ফেভারিট যে! রোজ সকালে উঠে রবীন্দ্র সরোবরের চারদিকে মাইল দু-এক হাঁটেন। বাড়ি ফিরে সেই যে খবরের কাগজ, বই আর ম্যাগাজিন

নিয়ে বসেন, স্নান খাওয়া বাদে তাঁকে ওঠানো দায়। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তাঁর। যা একবার পড়েন মস্তিস্কের ধূসর কোষে তা গাঁথা হয়ে যায় চিরকালের মতো। তবুও পছন্দের খবর পেলে কেটে রাখেন আর খাতায় সেঁটে রাখেন সেসব খবর। তবে জ্যাঠা চিরকাল হিংসার বিরোধী। গান্ধীবাদী ছিলেন। স্বাধীনতার সশস্ত্র আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেননি কোনোদিনই। ফেলুর তখন আট বছর বয়স। কাকা তাঁকে সদ্য কিনে দিয়েছেন নতুন এয়ারগান। কার অ্যান্ড মহলানবিশের দোকান থেকে। সেই বন্দুকে একটা শালিক পাখি মেরে ফেলুর কী আনন্দ! কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল জ্যাঠার কাছে। ভেবেছিল জ্যাঠা খুশি হবেন। কোথায় কী! সিধুজ্যাঠার মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো গম্ভীর।

'কী হয়েছে সিধুজ্যাঠা?'

'ও তোমার কী ক্ষতি করেছিল ফেলু, যে তুমি ওকে মারলে? এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করে ক্ষুধা নিবারণের জন্য অথবা আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু তুমি হত্যা করেছ আনন্দ পাবার জন্য। এর চেয়ে বড়ো পাপ আর হয় না ফেলু, আর হয় না।'

ফেলুর মাথা নীচু। চোখে জল।

'তুমি আজই প্রতিজ্ঞা করো ফেলু, জীবনে কোনোদিন কোনো নিরীহ জীব হত্যা করবে না...'

ফেলু কথা দিল। সেকথা চিরকাল সে রেখেছিল। ফেলু ভালোবাসে ধাঁধা আর হেঁয়ালির বই। 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ধাঁধা থেকে স্যাম লয়েড, লুই ক্যারলের ধাঁধা গোগ্রাসে গেলে ফেলু। কাকা তাকে ভরতি করে দিয়েছেন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। ভরতির দিন ক্লাসের একটি ছেলে গলা তুলে তাকে

জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী ভাই?'

—প্রদোষ চন্দ্র মিত্র।

—আর ডাকনাম?

ফেলুর কোনো ধারণাই ছিল না স্কুলে ডাকনাম বলতে নেই। সেই থেকে অনেকদিন অবধি ক্লাসের ছেলেরা তাকে ভালোনাম ধরে ডাকেনি। সে-নাম শুধু ব্যবহার করতেন মাস্টারমশাইরা।

ফেলুর ছবি আঁকার হাত ছোটো থেকেই বেশ ভালো ছিল। একবার দেখেই সে মানুষের পোর্ট্রেট আঁকত নির্ভুলভাবে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ড্রয়িং মাস্টার আশুবাবুর খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল সে। বুড়ো মানুষ। মাথাভরা টাক। রোগা প্যাঁকাটির মতো চেহারা। বলতেন, 'অরে তোরা Zতেই ফেলু ফেলু কইস না ক্যান, Sসবি আঁকায় অ এক্কেরে পাশু। শুধা পাশু না, একশোয় একশো পাইয়া পাশু।' আর এই স্কুলেই ড্রিল স্যার সনৎবাবুর কাছে ফেলুর ক্রিকেট খেলার হাতেখড়ি। স্লো স্পিন বল করতে প্রায় হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন স্যার। স্কুলের পর সিটি কলেজ। ইংরেজিতে অনার্স। এম এ করার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ফিফটি এইটে লখনৌতে গেছিল ক্রিকেট খেলতে। রোহিংটন বারিয়া ট্রফিতে। কিন্তু সেবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। পরের বছর বেনারসে গিয়ে হিন্দু ইউনিভার্সিটির সঙ্গে খেলায় দুই ইনিংসে মাত্র আটষট্টি রান দিয়ে সাতটা উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল। টেস্ট ম্যাচ দেখার দারুণ নেশাটা প্রায় শেষদিন অবধি ছিল ফেলুর মধ্যে। প্রথম প্রথম শ্যামপুকুরের গণপতি চ্যাটার্জি ওকে খেলার টিকিটও জোগাড় করে দিতেন। শেষদিকে ডালমিয়ার সঙ্গে ওর একটা পরিচিতি হয়। ইডেনে টিকিট পেতে তখন আর অসুবিধা হত না।

সিধুজ্যাঠা আর তারিণীখুড়ো ওকে শেখাতেন নানারকম ইনডোর গেম। প্রায় একশোরকম ইনডোর গেম শেখা হয়ে গেছিল ফেলুর। এর মধ্যে দাবা আর স্ক্র্যাবল ছিল ওর ফেভারিট। তবে ছোটো থেকেই তারিণীখুড়ো এমন এক জিনিসের নেশা ধরিয়েছিলেন, যা সারাজীবন ফেলুর সঙ্গে ছিল। ম্যাজিকের নেশা।

একবার ফেলুদের বাড়ি এসেই একখানা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'বাপরে! যা বোকা বনলুম এবার!'

'কী হয়েছে খুড়ো?' ফেলু জিজ্ঞাসা করতেই তারিণী জানালেন তিনি সবে একজন ম্যাজিশিয়ানের ম্যানেজারির চাকরি ছেড়ে এসেছেন। ম্যানেজারের আসল নাম কেউ জানে না, স্টেজের নাম চমকলাল। স্টেজ ইলিউশন তো আছেই সঙ্গে থট রিডিং-এ পাকা। চমকলালের গল্প শুনে ফেলু মনে মনে তাঁকে গুরু বলে মেনে নেয়। একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কাকার সঙ্গে এক বিয়েবাড়িতে গিয়েছিল ফেলু। সেখানে ফরাসে অক্ষয়বাবু নামে একজন বসে ছিলেন। সবাই তাঁকে ধরাধরি করছিল ম্যাজিক দেখানোর জন্য। অনেক বলা-কওয়ার পরে তিনি এক আশ্চর্য ম্যাজিক দেখালেন। প্রথমে পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে গড়িয়ে দিলেন। তারপর আঙুল থেকে খুলে নিলেন আংটিটা। সেই আংটিকে 'যাঃ' বলতেই আংটি বাধ্য ছেলের মতো আধুলির কাছে গিয়ে আধুলিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

এই দুটো ঘটনা থেকে কিছুদিনের জন্য হলেও ফেলুর মাথায় ম্যাজিকের ভূত চাপে। তাসের ম্যাজিক, হাতসাফাই, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যাস চলতে লাগল দিনরাত। সময় পেলেই এক প্যাকেট তাস নিয়ে হাতের ঝাঁকুনিতে হরতনের এক্কাটাকে একেবারে ওপরে নিয়ে আসার চেষ্টা চালায়। সঙ্গে তারিণী শিখিয়েছিলেন হিপনোটিজমের গোড়ার কিছু প্যাঁচপয়জার। ফলে অনেক চেষ্টা করেও ফেলুকে কখনো হিপনোটাইজ করা যেত না।

ফেলু বড়ো হতে লাগল। দু-জনের সংসারে একজন মহিলা ছাড়া আর চলে না। বিনয়ের জন্যে মেয়ের খোঁজ চলল। আর

তখনই জানা গেল সবার অগোচরে বিনয় নিয়মিত পত্রালাপ চালিয়ে গেছে তার বউদির বোন পূর্ণিমার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, সে-আলাপ এখন গভীর প্রেমের রূপ নিয়েছে। এই বিয়েতে কারো আপত্তির কোনো অবকাশই ছিল না। ফলে প্রায় নিরুদ্‌বেগেই শুভদিন দেখে ফিফটি ওয়ানের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ণিমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বিনয়কৃষ্ণর। একেবারে ঘরোয়া সে-বিয়েতে তারিণী, সিদ্ধেশ্বর ছাড়াও এসেছিলেন জয়কৃষ্ণর দার্জিলিং-প্রবাসী বন্ধু রাজেন মজুমদার। ফেলুর বয়স তখন বারো।

## ১১

কাহিনির ঠিক এই জায়গায় বোধ হয় প্রথম পুরুষ থেকে বেরিয়ে উত্তম পুরুষে আসা উচিত। বিয়ের এক বছরের মাথায় আর এক ফাল্গুন মাসে, সরস্বতী পুজোর দিন (২২ ফেব্রুয়ারি) আমার জন্ম। বাবা নাম রেখেছিলেন তপেশ রঞ্জন। ছোটো থেকেই ফেলুদা আমায় তোপসে বলে ডাকে। এই নামটা আমার এককালে বেশ অপছন্দ ছিল। এই নামে বিচ্ছিরি দেখতে একটা মাছ আছে। পরে ফেলুদাই আমাকে বলে যে সাহেবরা নাকি এই মাছকে ডাকতেন ম্যাঙ্গো ফিশ বলে। শুধু এই মাছের ভাজা খাবেন বলে কত সাহেব ম্যালেরিয়ার প্রকোপ উপেক্ষা করেও এদেশে থেকে গেছেন বছরের পর বছর। কবি ঈশ্বর গুপ্ত নাকি এই মাছকে নিয়েই কবিতা লিখেছেন। আমি যখন ছোটো ছিলাম, ফেলুদা দুলে দুলে আওড়াত—

কষিত-কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥

মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥
পাখি নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস সব-অঙ্গে মাখা॥

ছোটোবেলায় রেগে যেতাম। পরে আর রাগতাম না। আমার যখন সাত বছর বয়স তখনই ফেলুদা আমায় সাইকেল চড়া শিখিয়েছিল। সুযোগ পেলেই ধমকধামক চলত, দাদাগিরি ফলাত। আমার দিব্যি লাগত। বাবাও বলতেন, 'ইস্কুলে সব পাবি, কিন্তু ফেলুর মতো মাস্টার পাবি না।' ফেলুদাই আমাকে ইংরেজি বই পড়ানোর অভ্যেস করায়। টিনটিন নামটা প্রথম ওর মুখেই শুনেছিলাম, মনে আছে। চোখ খুব ভালো, ঘড়ি ধরে তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ড চোখের পাতা না ফেলে থাকতে পারত। মাঝে মাঝে নিয়ে যেত সিনেমা দেখাতে। 'এন্টার দ্য ড্রাগন' ছবিটা ওর সঙ্গেই প্রথমবার দেখি। আমি যখন কৈশোরে তখনই আমার বাবাকে লুকিয়ে ও সিগারেট খেত। এই বদ অভ্যাসটি ওকে ধরিয়েছিল ওর কলেজের বন্ধু সুহৃদ সেনগুপ্ত। সুহৃদদার ফেভারিট ব্র্যান্ড ছিল চারমিনার। ফেলুদারও তাই।

আমি যখন বেশ ছোটো, তখন থেকে ফেলুদা আমার হিরো। তিন মাস শিখে রাইফেল কম্পিটিশনে ফার্স্ট। দারুণ টিপ বন্দুকে। তাসের ম্যাজিক জানে নানারকম। ক্যারাটে জানে। জুজুৎসু জানে। আবার *গ্রেট গেমস অফ চেস* বই দেখে দাবা খেলে। ফেলুদার মতো আমারও পড়াশুনো বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। সেখানে পড়তে পড়তেই, তখন বোধ হয় ক্লাস সিক্স, বাবা বললেন, 'কিছুদিন ছুটি পেয়েছি। চল, দার্জিলিংটা ঘুরে

আসি।' আমি তখন তেরো মতন। ফেলুদা সাতাশ। আর সেই দার্জিলিং-এ গিয়েই রাজেনবাবুর কেস সল্‌ভ করল ফেলুদা। সেই ওর প্রথম কেস।

তখন ও একটা সাহেবি সওদাগরি অফিসে নিয়মিত চাকরি করে। টানা দুই বছর কাজ করে দিন পনেরো ছুটি নিয়েছিল। সেই ছুটিতেই আমরা সবাই মিলে গেছিলাম দার্জিলিং। পরে এক গরমের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে গ্যাংটকের সেই গণ্ডগোলের পর কলকাতায় ফিরেছি, একদিন দেখি বেলা দশটায় বৈঠকখানায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে 'SPAN' পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে। দেখে অবাক হলাম, 'তুমি অফিস যাবে না?' বলতেই সেই একপেশে হাসিটা হেসে বলল, 'নিজের ওপর কনফিডেন্সটা বেড়ে গেছে রে, তোপসে। চাকরিটা ছেড়েই দিলাম।'

সেই যে ছাড়ল, আর জীবনে কোনোদিন বাঁধাধরা চাকরিতে ওকে বাঁধা যায়নি। তবে রোজগার বা খ্যাতি কোনোটাই কম ছিল না। খবরের কাগজে দু-বার ওর ছবি সমেত সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। সিধুজ্যাঠা যত্ন করে সেসব কাটিং রেখে দিয়েছিলেন। ফলে পরিচিতিও পেয়েছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরে। জমিদার মহীতোষ সিং রায় থেকে কেঁদুলির শ্মশানের মস্তান, সবাই ওর ভক্ত। অবশ্যি মানিকবাবুর লেখা ওর কীর্তিকাহিনিগুলো যে এই জনপ্রিয়তার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী, তা না বললেও চলে। শুরুর দিকে রোজগার তেমন না হলেও পরে ওর রোজগার বেশ বেড়েছিল। কেস হাতে নিয়েই হাজার টাকা অ্যাডভান্স আর সল্‌ভ করলে আরও হাজার। তখনকার দিনে পরিমাণটা নেহাত কম ছিল না। ধীরে ধীরে মাসে কুড়ি হাজার অবদি আয় করত। তখন একবার মা অসুস্থ হয়ে

পড়েন। আমাদের কাজের লোক শ্রীনাথদা রান্না জানতেন না। ফেলুদাই তখন রান্নার জন্য উড়িয়া রাঁধুনি জগন্নাথকে রেখেছিল।

সোনার কেল্লার সেই বিখ্যাত অভিযানের পরে আমরা সবাই তারা রোডের একতলা বাড়ি ছেড়ে রজনী সেন রোডের দোতলা বাড়িটা কিনলাম। ফেলুদাও কিছু টাকা দিল। আমি থাকতাম দোতলায়। ফেলুদার একতলাই পছন্দ। একবার নিজের ফ্ল্যাট কেনার কথা ভেবেছিল বটে, কিন্তু বাবার ধমকে সে-চেষ্টা আর বাস্তবে ফলাতে পারেনি।

তবে জ্যাঠা জয়কৃষ্ণর একটা বাতিক ফেলুদার ছিল। হাত দেখা, রত্ন, প্ল্যানচেট ইত্যাদি বিষয়ে ওর দারুণ উৎসাহ। খুব যে বিশ্বাস করত, তা বলা মুশকিল, তবে মনের জানলাগুলো খোলা রাখত সর্বদাই। তবে কুসংস্কার যাকে বলে, সেটা কোনোকালেই ছিল না ওর। কোনোদিন পুজো দিতে দেখিনি। হয়তো জ্যাঠার বৌদ্ধভাব ওর মধ্যেও কিছুটা ছিল।

তার পরের আট বছর যে কীভাবে কেটে গেছে তার অনেকটাই সবার জানা। একের পর এক কেস সমাধান করতে লাগল ফেলুদা (একমাত্র চন্দননগরের জোড়া খুনের কেসটা বাদে)। মানিকবাবু তাঁর সোনার কলমে সেসব লিখে গেছেন। আমার নামে। প্রতিটা উপন্যাস 'দেশ' পত্রিকায় বেরোনোর আগে ওঁর বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন আমাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন যাবতীয় তথ্য। তারপর লিখে ফেলতেন তাঁর জাদুকরি ভাষায়।

১৯৬৬ থেকে ১৯৯২— এই ছাব্বিশ বছরে পঁয়ত্রিশটা অভিযানের কথা লিখেছিলেন তিনি। সব সেই আট বছরের

ঘটনা। বাকি রয়ে গেল আরও কত। কিছু মানিকবাবু ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছেন। কারণ ফেলুদার অভিযানকে চিরকাল কিশোরপাঠ্য রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। যেসব কেসের ঘটনা পরম্পরা কিশোর উপযোগী নয়, ইচ্ছে করেই তাদের রাখেননি তিনি। এদের সবকটায় আমি ছিলাম না। কী হয়েছিল ফেলুদা কোনোদিন বলেওনি। কিন্তু কয়েকটা কেসের কথা আমি জানি। তেমনভাবে না জড়িয়ে থাকলেও জানি। আর জানি, সেগুলো না ঘটলে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ফেলুদাকে গোয়েন্দাগিরি ছাড়তে হত না। আমার অক্ষম কলমে মানিকবাবুর মতো জোর নেই। তবু এই নোটবইয়ের পাতায় সেসব ঘটনাগুলোই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। না বললে মৃত্যুর পরেও শান্তি পাব না।

## ১২

রেস নিয়ে একটা আগ্রহ ফেলুদার মধ্যে চিরকাল ছিল। আর এমন কপাল, আমাদের অনেক ক্লায়েন্টেরই ছিল রেসের বাতিক। গিরীন বিশ্বাস, প্রদ্যুম্ন মল্লিক, দীননাথ লাহিড়ী, অরুণ চৌধুরী থেকে প্রবীর মজুমদার। তবে ফেলুদা নিজে রেসের মাঠে যেত না। জুয়ো থেকে দূরেই থাকত সবসময়। বলত, 'সর্বদা মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের কথা মনে রাখবি। জুয়ো খেলে কী দশা হয়েছিল। তাহলেই আর জুয়ো খেলার ইচ্ছে জাগবে না।' কাঠমান্ডুর কেসে রেসের মাঠে আমিও গেছিলাম, সে তো তদন্তের জন্য। সেই ফেলুদাকেই দিন সাতেক রেসের মাঠে পড়ে থাকতে হয়েছিল। ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের ইলোরা যাওয়ার বছর দুয়েক আগে। মানে, আমি তখন ক্লাস এইট। সেবার আমাকে

সঙ্গে নেয়নি ফেলুদা। পরে ওর থেকে শুনেছিলাম।

সেদিন সকালে অন্যদিনের মতোই খুঁটিয়ে পত্রিকা পড়ছিল ফেলুদা। আমি পাশে বসে একটা চটি বই ওলটাচ্ছি। বইয়ের নাম *ভয়ঙ্করের অভিযান*। লেখক কে এক শ্রীস্বপনকুমার। লালমোহনবাবুর মুখে এঁর কথা ইদানীং খুব শুনছিলাম। অক্রূর নন্দী আচমকা মারা যাওয়ার পর ইনিই নাকি বাজার কাঁপাচ্ছেন। কে যে এই শ্রীস্বপনকুমার কেউ জানে না। কেউ বলে তিনি জ্যোতিষ ভৃগু, কেউ বলে ডাক্তার। তিনি যে-ই হোন, তাঁর লেখা চৌষট্টি পাতার বইয়ের বিক্রি হচ্ছে মুড়িমুড়কির মতো। এঁর গোয়েন্দার নাম দীপক চ্যাটার্জী। সঙ্গী রতনলাল। ভিলেনের নামগুলোও অদ্ভুত। ড্রাগন, কালনাগিনী, বাজপাখি এমনি সব। তাঁর লেখা *বাজপাখির রণহুংকার, পাতালপুরীতে ড্রাগন* পড়ছে আট থেকে আশি সবাই। জটায়ুর বই এডিশন শেষ হতে বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। বেচারা জটায়ু তাই ইদানীং মনমরা। 'ধুর! ধুর! এরা সব লেখক নাকি? সব থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।' আমি অবশ্যি পড়ে প্রখর রুদ্রর কাহিনি থেকে খুব বেশি পার্থক্য পাইনি। বরং এ ভদ্রলোকের ভাষা জটায়ুর থেকে অনেক বেশি ঝরঝরে আর টান টান। ফলে পড়তে গেলে আটকায় না। জটায়ুর রাগের কারণ তাই স্বাভাবিক।

আমি সবে বইয়ের মাঝামাঝি, এমন সময় দরজায় জোরে কেউ ধাক্কা দিল।

'নিশ্চয়ই ক্লায়েন্ট। আর খুব ব্যতিব্যস্ত। নইলে কলিং বেল থাকতে কেউ দরজা ধাক্কায় না।' বলে নিজেই উঠে দরজা খুলে দিল ফেলুদা। বেঁটেখাটো, ফর্সা, ছোটো করে ছাঁটা চুল যে মানুষটা

প্রায় হুমড়ি খেয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি যে বাঙালি নন, তা দেখেই বোঝা যায়। কথাও বললেন ভাঙা ভাঙা বাংলায়।

'মি মিত্তির আপনি হামাকে বাঁচান। পুলিশ হামাকে ফাঁসিয়ে দিবার চেষ্টা করছে। হামি কুছু করি নাই।'

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম জোসেফ ব্রাউন। পেশায় ঘোড়ার জকি। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তখনই খেয়াল করলাম, ভদ্রলোকের দুটো পা অদ্ভুতরকম বাঁকা। যাঁরা জকি হন, তাঁদের অনেকের এমন হয়। শরদিন্দুবাবুর একটা লেখায় পড়েছিলাম।

'কেসটা কী?' ফেলুদা বলল।

'হ্যাপি-গো-লাকি-কে কেউ ভিষ দিয়াছে। হি ইজ ডেড অ্যান্ড দ্য পোলিস ইজ সাসপেক্টিং মি।'

জানা গেল কলকাতায় সে-সপ্তাহে বিশাল বড়ো এক রেসের বাজি হবে। সেই বাজিতে হ্যাপি-গো-লাকি নামের ঘোড়ার দৌড়োনোর কথা। গায়ের রং ধবধবে সাদা। মাথায় একটা কালো দাগ।

'ঠিক সিলভার ব্লেজের মতো। তাই না ফেলুদা?'

'শাব্বাশ, তোপসে। একদম ঠিক বলেছিস। শার্লক হোমস পড়াটা কাজে লাগছে দেখছি...'

হ্যাপি-গো-লাকির মালিক কলকাতার এক বিশাল শিল্পপতি। রাজবল্লভ গোয়েঙ্কা। পারিবারিক শিল্পপতি নন। নিজের ক্ষমতায় আজ এই জায়গায় পৌঁছেছেন। বিয়ে করেননি। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ি। গতকাল বিকেলে যখন প্র্যাকটিসের জন্য ঘোড়াটিকে দৌড় করায়, তখনও সে বেশ চনমনে ছিল। তাকে আস্তাবলে ঢোকানোর পরে মালিক রাজবল্লভ

তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে আসেন। এটা ওঁর অনেকদিনের অভ্যেস। ঠিক তখন থেকেই হ্যাপি-গো-লাকি নাকি অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে। বহুবার গায়ে হাত বোলানোর চেষ্টা সত্ত্বেও সে কিছুতেই গায়ে হাত দিতে দেয়নি। ক্রমাগত অস্থিরতা দেখিয়ে গেছে। রাজবল্লভ অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে শেষে জোসেফকে হান্টার আনতে বলেন। সে-হান্টার ব্যবহার করতে হয়নি। তিনি নিজেই ততক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বিরক্ত হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি শুধু বার বার মাথা নাড়তে নাড়তে 'কী ব্যাপার, এমন তো করে না' বলতে বলতে চলে যান। সে রাতে হ্যাপি-গো-লাকি কিছু খায়নি। জোসেফ অনেক চেষ্টা করেও একটা খাবারের দানা মুখে তোলাতে পারেননি। কোনো অজানা কারণে বার বার মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল সে।

সকালে উঠে জোসেফ দেখেন হ্যাপি মরে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। গোটা শরীর শক্ত। রাজবল্লভ সঙ্গেসঙ্গে পুলিশ ডাকেন। পুলিশ সন্দেহ করে টাকার লোভে জোসেফই হ্যাপিকে খুন করেছেন, যাতে সে রেসের বাজি জিততে না পারে। জোসেফ উপায়ের খোঁজে রেসের মাঠের নিয়মিত যাত্রী দীননাথ লাহিড়ীকে ফোন করেন। তিনিই ফেলুদার কথা বলেছেন।

কথা চলতে চলতে আমাদের বাড়ির সামনে একটা জিপ গাড়ি থামার আওয়াজ পেলাম। তারপরেই কলিং বেলের কর্কশ শব্দ। দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন উর্দিধারী এক সুপুরুষ পুলিশ অফিসার।

'আমি পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে আসছি। ইনস্পেকটর হরেন মুৎসুদ্দি। জোসেফ ব্রাউন, আপনার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে।'
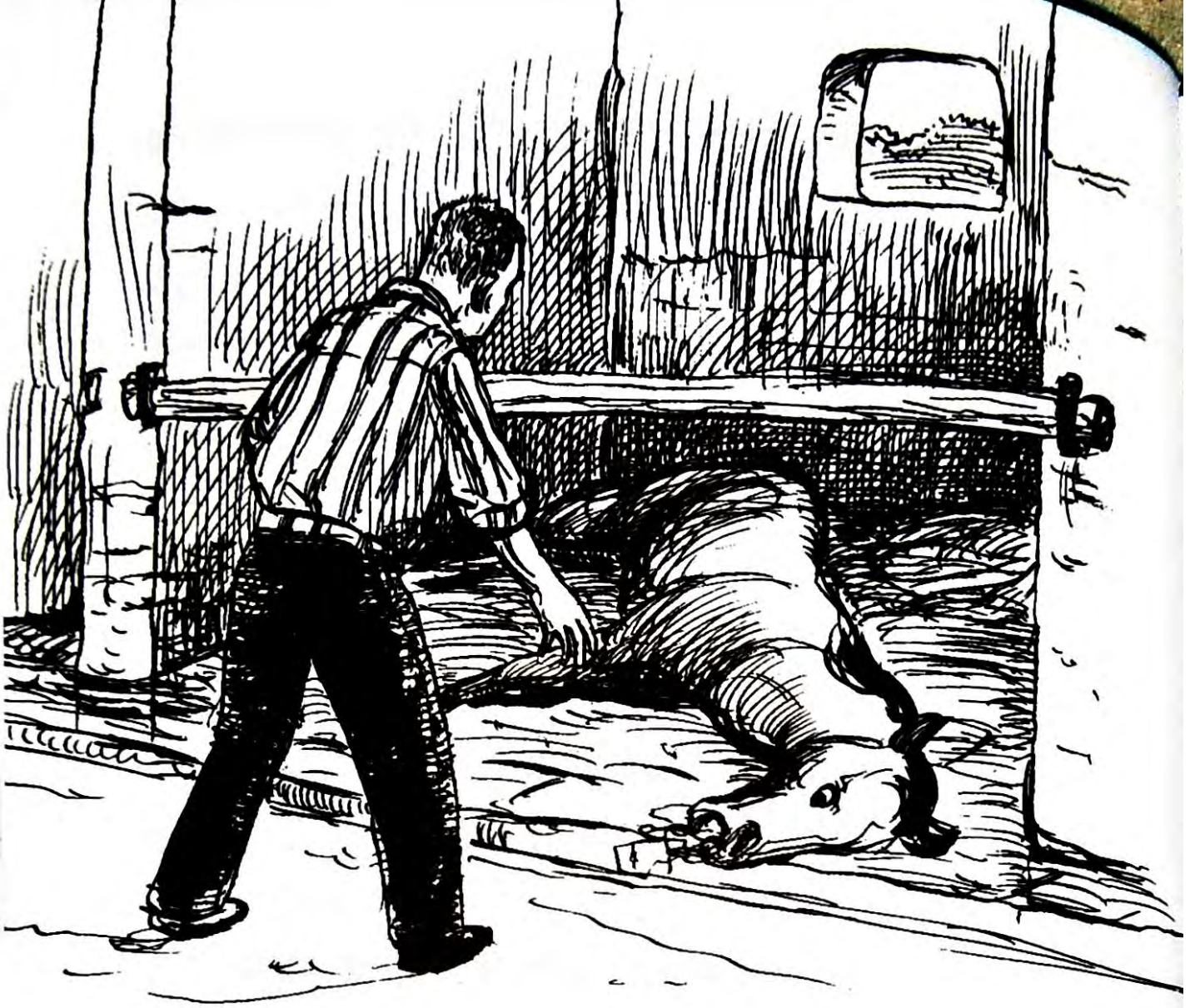
জোসেফের মুখ কাঁচুমাচু হয়ে এল। ফেলুদার গলা নরম, 'শুনুন মি জোসেফ, পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা আমাদের করতেই হবে। আপনার কেসটা আমি নিচ্ছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার যেটা দরকার সেটা একজন ভালো উকিল, যে আপনাকে জামিন দিতে পারবে।'

'কিন্তু আমার যে কোনো উকিলের সোঙ্গে জান পেহচান নেই মি মিত্তির।'

'আমারও যে আছে, তা নয়। তবে এঁর নাম খুব শুনেছি। আপনি এঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। নিউ আলিপুরে বাড়ি,' বলে একটা কাগজ ছিঁড়ে কী যেন লিখে দিল। আমি উঁকি

মেরে দেখলাম লেখা আছে, 'ব্যারিস্টার প্রসন্নকুমার বাসু। ক্রিমিনাল ল-ইয়ার।'

১৩

জোসেফ পুলিশের সঙ্গে চলে যেতে-না-যেতেই লাফিয়ে উঠে পড়ল ফেলুদা। 'যাই, একবার চট করে রেসকোর্সটা ঘুরে আসি।' আমি যেতে চাইলে খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'বাচ্চা ছেলে, এখনই রেসের মাঠে যাবার শখ!'

সে ক-টাদিন আমি অপেক্ষা করতাম ফেলুদা কখন বাড়ি আসবে। প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফিরত। সকালে উঠতে দেরি হত। আমি স্কুলে চলে যেতাম। তবু মাঝেমধ্যে দেখা হলে কেস নিয়ে টুকরোটাকরা নানা খবর দিত। একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখি ফেলুদা নিজের শোয়ার ঘরে বসে নীল রঙের একটা ডায়েরিতে কী যেন লিখছে আর একটার পর একটা চারমিনার শেষ করছে।

'কী হয়েছে, ফেলুদা?'

'হিসেব মিলছে না রে তোপসে, একটা ভয়ানক জাল চোখের সামনে ফুটে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। যতটা সরল ভাবছিস, তা নয়। ব্যাপারটায় একটা কুৎসিত শয়তানি লুকিয়ে আছে।'

'মানে?'

'হ্যাপি-গো-লাকিকে খুন করা হয়েছে রেসে জিততে নয়। আমি খবর নিয়ে দেখেছি। শেষ কয়েকটা রেসে হ্যাপি চ্যাম্পিয়ন হয়নি। হয়েছিল হুকুমচাঁদ নামে একটা কালো ঘোড়া। তাই খুনের মোটিভটা ঠিক জমছে না রে তোপসে।'

'এই কেসে তোমার সবচেয়ে অদ্ভুত কী লাগল?'

'মরার আগের দিন বিকেলে হ্যাপি-গো-লাকির অদ্ভুত আচরণ।'

'কিন্তু ও তো আগের দিন বিকেলে একেবারে স্বাভাবিক ছিল!'

'গাধা! ভেবে দেখ, নিজের মনিবকে ও গায়ে হাত লাগাতে দেয়নি,' বলেই ফেলুদা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল, 'রানাপ্রতাপের ঘোড়ার নাম কী ছিল?'

আমি একটু থতোমতো খেয়ে বললাম, 'চেতক, কেন?'

'আর আলেকজান্ডারের?'

'বুসিফেলাস।'

'আর, এরা এত বিখ্যাত কেন বল তো?'

'এরা যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছে, প্রভুভক্ত ছিল প্রচণ্ড...'

'গুড। মানে, ঘোড়া প্রচণ্ড প্রভুভক্ত হয়। তাহলে সেই ঘোড়া আচমকা তার প্রভুকে চিনতে অস্বীকার করবে কেন?'

'বলা মুশকিল। ধরো, ঘোড়ার যদি মুড ঠিক না থাকে, অথবা...'

'অথবা, যাকে আমরা ঘোড়ার মালিক ভাবছি, সে যদি ঘোড়ার মালিক না হয়। ভেবে দেখ তোপসে, শার্লক হোমসের গল্পেও কুকুরটা রাতে কিচ্ছু করেনি, কারণ চোর ছিল তার নিজের মালিক। এখানে গোটা ব্যাপারটা জাস্ট উলটো।'

কেসটা সল্‌ভ করতে ঠিক দু-দিন লেগেছিল ফেলুদার। আর তাতে যা বেরোল সে এক ভয়ানক সত্য। রাজবল্লভ গোয়েঙ্কার নাকি এক যমজ ভাই ছিল। প্রাণবল্লভ। অপদার্থ। কিশোর বয়স থেকেই নিখোঁজ। অনেকদিন পর তিনি ভাইয়ের কাছে এসে সম্পত্তির অংশ দাবি করেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই রাজবল্লভ অস্বীকার করলে তিনি একান্তে রাজবল্লভকে গলা টিপে খুন করে

নিজে রাজবল্লভ সেজে বসেন। তিনি বুঝেছিলেন সবাইকে ধোঁকা দিলেও হ্যাপি-গো-লাকিকে ধোঁকা দেওয়া অসম্ভব। তাই হয়েছিল। হ্যাপি তাঁকে চিনে ফেলে। আর জোসেফকে হান্টার আনতে পাঠিয়ে প্রাণবল্লভ ঘোড়ার গলায় বিষাক্ত সিরিঞ্জ ফুটিয়ে দেন।

দুঃখের কথা এই কেস কোনোদিন প্রকাশ করা যায়নি। রাজবল্লভের কোম্পানির ট্রাস্টিরা বাধা দিয়েছিল। রাজবল্লভ কোনো ওয়ারিশ রেখে যাননি। তাঁর আচমকা মৃত্যুতে কোম্পানি ভেঙে পড়তে পারে। ফলে কাজ হারাবেন বেশ কয়েকশো মানুষ। তাই কোম্পানির স্বার্থে গোটা ব্যাপারটা তাঁরা চেপে যেতে অনুরোধ করেন। প্রাণবল্লভ তাঁর দাদা সেজে গোটা কোম্পানি ট্রাস্টিদের হাতে তুলে দেন। তাঁকে মুচলেকা দিতে হয়, তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন চিরকালের মতো। ব্যাপারটা জানতেন শুধু দু-জন। ফেলুদা আর পার্ক স্ট্রিট থানার হরেন মুৎসুদ্দি। তখন থেকেই দু-জনের একটা সখ্যতা তৈরি হয়। ভুবনেশ্বরের যক্ষী মূর্তির তদন্তে এই হরেন মুৎসুদ্দি আমাদের কত উপকার করেছিলেন তা অনেকেরই জানা।

জোসেফের কী হল? ব্যারিস্টার পি কে বাসু তাঁর কেস নিয়েছিলেন। কোর্টে তিনি যুক্তিজালে বিপক্ষের কেস পুরো ফর্দাফাঁই করে দেন। জোসেফের ছাড়া পেতে কোনো বেগ পেতে হয়নি।

## ১৪

এই মামলা শেষ হতে-না-হতে আর একটা মামলায় হাত দিয়েছিল ফেলুদা। সে-মামলার শুরুও হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, আগের মামলার জকি জোসেফ ব্রাউন এই

কেসের সন্ধান আনে ফেলুদার কাছে। সেদিন বিকেলে সিধুজ্যাঠার বাড়ি গেছিলাম আমি আর ফেলুদা। ফেলুদা মার্টিন গার্ডনারের একটা অঙ্কের বই ফেরত দিয়ে এলেরি কুইন মিস্ট্রি ম্যাগাজিনের দুটো সংখ্যা নিয়ে এল। আমিও নেভিল কার্ডাসের লেখা *ইংলিশ ক্রিকেট* বইটা ধার নিয়ে এলাম।

বাড়ি ঢুকে দেখি শ্রীনাথদা দু-জনকে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে রেখেছে। একজন আমাদের পরিচিত জোসেফ, অন্যজন প্রায় তাঁরই বয়েসি এক যুবক। এও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। জোসেফ পরিচয় করিয়ে দিল। যুবকের নাম পল জুব্রিস্কি। জোসেফের মতো এও থাকে ফরডাইস লেনে। পেশা হোটেলে ম্যান্ডোলিন বাজানো। সংসার বলতে সে আর তার বৃদ্ধ কাকা মার্কাস। সেদিন সকালেই মার্কাসকে রাস্তার মোড়ে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। বুকে একটা হাতির দাঁতওয়ালা ছুরি আমূল বসানো। ডাক্তারের হিসেব বলছে খুন হয়েছে মাঝরাতে। কাকার সঙ্গে দারুণ সদ্ভাব ছিল না পলের। প্রায়ই টাকাপয়সা নিয়ে ঝামেলা বাধত। ফলে কিছুটা সন্দেহ তাঁর ওপরেও পড়ছে। বাকি কথাবার্তা ইংরেজিতেই হল, আমি বাংলায় লিখছি।

'কেসটা কে দেখছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'বউবাজার থানার ওসি, মৃত্যুঞ্জয় সোম।'

'ওহ। উনি তো চেনা মানুষ। কী করতেন আপনার কাকা?'

'সেই অর্থে কিছুই না। কিন্তু কাকার প্রচুর টাকা ছিল। দামি জামাকাপড় পরতেন, দামি মদ খেতেন। গ্লেনফিডিচ ছাড়া মুখে রুচত না। বছর তিনেক আগে এক উকিলের কেরানি ছিলেন। কিন্তু ইদানীং আমি কাকাকে গায়ে খেটে কোনো কাজ করতে দেখিনি।'

'বাড়ি থেকে বেরোতেন?'

'না বললেই চলে। কোনো একটা ভয় কাজ করত তাঁর মধ্যে। তাঁর ঘরেও কাউকে ঢুকতে দিতেন না। সন্ধ্যার পর তো কিছুতেই তাঁকে বের করা যেত না। ঘরে বসে রেডিয়ো শুনতেন। তাও দরজা বন্ধ করে। কিন্তু মাসে একবার করে কাকা রাতে বেরোতেন। কদাচিৎ দু-বার। ডিনার করে বেরোতেন। কখন ফিরতেন জানি না। কারণ আমার ঘর দোতলায়। হোটেলের কাজ সেরে আমি রাত একটা নাগাদ ফিরতাম। তখনও কাকা আসতেন না। পরদিন ভোরে অনেক দেরি করে ঘুম ভাঙত তাঁর। ব্রেকফাস্ট মিস করতেন।'

'কোনোদিন জিজ্ঞেস করেননি, কোথায় যান?'

'করেছি। অদ্ভুত উত্তর দিতেন। যতবারই জিজ্ঞেস করেছি, কাব্য করতেন। বলতেন,

"In the old age black was not counted fair,
Or if it were, it bore not beauty's name;
But now is black beauty's successive heir,
And beauty slandered with a bastard shame"

মাসে একবার সেই বিউটির কাছেই নাকি তাঁকে যেতে হয়। আমার কাকার চরিত্র ভালো ছিল না মি মিত্তির।'

'আপনার কেসটা আমি নিচ্ছি। ইন্টারেস্টিং কেস। আমি বিকেলে যাচ্ছি আপনার বাড়ি।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলে উঠে পড়লেন দু-জনে।

'ফরডাইস লেনটা কোথায় ফেলুদা?' আমি বললাম।

ফেলুদা উঠে আলমারি থেকে একটা ঢাউস বই বের করল।

তাতে লালের ওপর সোনার জলে লেখা *ক্যালকাটা স্ট্রিট ডাইরেক্টরি*। পিছনের পাতায় বিশাল এক মানচিত্র। সেটাই খুলে আঙুল দিয়ে ফেলুদা দেখাতে লাগল, 'এই দ্যাখ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে পাকদণ্ডীর মতো ঘুরে ফরডাইস লেনের রাস্তাটা এক দিকে ডিক্সন লেনে, অন্য দিকে, সারপেনটাইন লেনে গিয়ে মিশেছে। সিধুজ্যাঠার মুখে শুনেছি, কাছেই স্কট লেনে ছিল বড়োসড়ো ঘোড়ার আস্তাবল। তার মালিক ছিলেন ফরডাইস সাহেব। তাই পাড়ার নাম ফরডাইস লেন। এটি এককালে ছিল পুরো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়া। পরে অবশ্যি অন্য ধর্মের মানুষ থাকতে শুরু করেন। একসময়ে এ পাড়াতেই ছিল ছ-টা মেসবাড়ি। কাকা প্রথম কলকাতায় এসে সেখানেই থাকতেন, তুই তখনও জন্মাসনি।

আমি অনেকদিন আগে কাকার সঙ্গে যেতাম। কাকার কিছু বন্ধু তখনও সেখানে ছিলেন। সন্ধ্যা নামলেই সুর করে পড়া হত নামতা। রাতের দিকে আসত বেলফুলওয়ালা, কুলফিমালাইওয়ালা। গভীর রাতে অ্যাংলো পাড়া থেকে শোনা যেত গিটার আর ম্যান্ডোলিনের সুর। নাঃ, যেতেই হচ্ছে রে তোপসে।'

আমিও যাব কথা ছিল। কিন্তু মা বেঁকে বসলেন। পরদিন থেকেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। যে বাবা প্রায়ই বলতেন 'ফেলুর মতো মাস্টার কি আছে স্কুলে?', তিনিও বেঁকে বসলেন। অগত্যা...

এই কেসের কথাও ফেলুদার মুখেই শুনতাম। মার্কাস সাহেবের ঘর থেকে কিচ্ছু চুরি যায়নি। ড্রয়ারে বেশ ক-টা এক-শো টাকার বান্ডিল পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে কুড়ি হাজার টাকা হবে। এত টাকা তাঁর কাছে কী করে এল সেটাও প্রশ্ন। মৃত মার্কাসের

পকেটে একটা চিঠি পেয়েছে পুলিশ। আলপিনে গাঁথা সেই চিঠিতে কিছু লেখা নেই। আছে অদ্ভুত এক চিহ্ন। হলুদ তুলোট কাগজে লাল সিঁদুরে আঁকা একটা বর্গাকার ক্ষেত্র। তার মাঝে ফুটে থাকা একটা পদ্মফুলের আকার। আর সেই পদ্মে দুটি ত্রিভুজ, সোজা আর উলটো। পুলিশ প্রায় পাগলের মতো খুঁজেও আর কোনো সূত্র পায়নি। ফেলুদাকে দেখেও বুঝতে পারছিলাম বেশ গভীর জলে পড়েছে। প্রায় কোনো বন্ধু বা শত্রু না থাকা ছেষট্টি বছরের এক বৃদ্ধকে এই নৃশংস খুন করতে জোরালো কোনো মোটিভ লাগে। সেই মোটিভটাই নেই। মারা যাওয়ার দিন প্রতিবেশীরা সাহেবের বাড়ি কোনো অচেনা লোককে আসতে দেখেননি। ছুরিতে কোনো হাতের ছাপ নেই। তবে বাঁট দেখে বোঝা যায় দামি ছুরি। একদিক চকচকে, অন্যদিকে খাঁজকাটা, যাকে বলে সেরেটেড। এধরনের দামি ছুরি খুব বেশি দেখা যায় না।

ঘটনার তিনদিন পরে, সেদিন রবিবার, ফেলুদা ঘুম থেকে উঠে যোগব্যায়াম, শীর্ষাসন করেই আমায় বলল, 'চ তো তোপসে, একবার সবজান্তা সিধুজ্যাঠার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। একবার বুদ্ধির গোড়াটায় ঝাঁকি না দিলে চলছে না।'

সিধুজ্যাঠা প্রায় টেবিলের সঙ্গে মাথা গুঁজে আতশকাচে কিছু দেখছিলেন। আমাদের দেখে একগাল হেসে বললেন, 'এসো এসো ফেলুচাঁদ আর তপেশচাঁদ। মার্কাস সাহেবের খুন নিয়ে কিছু বলবে মনে হচ্ছে!'

ফেলুদা হেসে ফেলল। 'আশ্চর্য আন্দাজ আপনার। কী করে বুঝলেন?'

'আন্দাজ আমি করি না, ফেলু। আন্দাজ জিনিসটাই খুব বাজে

ব্যাপার। মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়। আমি যা করি, তাকে তোমরা বল অনুমান, আর তোমার গুরু হোমস বলতেন ডিডাকশন। আজকের পত্রিকাতেই লিখেছে পুলিশ এই কেসের কোনো তল পাচ্ছে না। এটাও লিখেছে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি গোয়েন্দা নাকি এই কেসে সাহায্য করছে। সে যে তুমি ছাড়া আর কেউ না, তা বুঝতে কি খুব বেশি মগজাস্ত্রের প্রয়োজন? তুমিই বলো।'

'তা বটে। এসেছিলাম একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে। মার্কাস সাহেব নাকি প্রায়ই কারো সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। কোনো মহিলা। কে সেই মহিলা প্রশ্ন করলেই একটা কবিতা বলতেন। এটা কার লেখা, কী কবিতা, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তাই আপনার কাছে আসা...'

'বলো শুনি,' বলতেই ফেলুদা বুকপকেট থেকে একটা সাদা কাগজ বের করে পড়তে শুরু করল, 'In the old age black was not counted fair,/Or if it...' বলতে-না-বলতেই সিধুজ্যাঠার চোখ কপালে। 'সে কী ফেলু, তুমি শেক্ষপীরের লেখা চিনতে পারছ না!'

ফেলুদাও দেখলাম একটু থমকে গেল। সিধুজ্যাঠা বলেই চললেন, 'আরে তোমরা যাকে শেক্সপিয়র বল। এ যে তাঁরই লেখা। তুমি ডার্ক লেডি সনেটের নাম শোননি?'

ফেলুদা আর আমি দু-জনেই পাশাপাশি মাথা নাড়লাম। সিধুজ্যাঠা মাস্টারি কায়দায় বলে চললেন, 'সনেট কাকে বলে জানো তো? চোদ্দোটা পদের এক বিশেষ ধরনের কবিতা। এর উদ্ভব হয় মধ্যযুগে, ইতালিতে। এই কবিতাগুলো ১৪টি চরণে

তৈরি। প্রতিটি চরণে মোট ১৪টি করে অক্ষর থাকবে। আমাদের মাইকেলও ঢের সনেট লিখেছেন। শেক্সপিয়র লিখেছিলেন ১৫৪ টা সনেট। এর মধ্যে ১২৭ থেকে ১৫২ নম্বর সনেটে বার বার এক মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। শেক্সপিয়র তাঁকে উল্লেখ করেছেন ডার্ক লেডি বলে। কে এই ডার্ক লেডি, তা আজও বিশ্ববাসীর কাছে বিরাট রহস্য। অবশ্য ১৯৩০ সালে ডানকান সালকেড নামে এক গবেষক দাবি করেছিলেন তখনকার লন্ডনের এক কুখ্যাত বারবনিতা লুসি নেগ্রো বা ব্ল্যাক লুসি-ই নাকি আসলে এই ডার্ক লেডি।'

'হুঁ... মার্কাস সাহেবের চরিত্র নাকি বিশেষ সুবিধার ছিল না। ওঁর ভাইপোই বলেছেন। কিন্তু একটাই খটকা। আমি জিজ্ঞেস করে দেখেছি ইদানীং সেই মাসান্তের রাত্রিযাপনের পর ফিরে এসে কিছুদিন মার্কাস সাহেব রাজার হালে থাকতেন। পয়সা ওড়াতেন দু-হাতে। দোকানের ধারবাকি মিটিয়ে দিতেন পাইপয়সা সমেত। আপনি যা ইঙ্গিত করছেন জ্যাঠা, তাতে তো উলটোটাই হবার কথা... কিছু একটা ভুল হচ্ছে। টাকা ওড়াতে না, মার্কাস যেতেন টাকা আনতে... কিন্তু কোথা থেকে? আর কেনই-বা একজন অকর্মণ্য লোককে কেউ মাসের পর মাস টাকা দিয়ে যাবে? খটকা... খটকা...' বলেই পকেট থেকে আর একটা কাগজ বের করল ফেলুদা। বাড়িয়ে ধরল সিধুজ্যাঠার দিকে, 'দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না? মৃতের পকেটে একটা খামের মধ্যে এই চিহ্ন পাওয়া গেছে। আমি কপি করে এনেছি।'

ছবি দেখে সিধুজ্যাঠার ভুরু কুঁচকে গেল। 'এ ছবি সাহেবের পকেটে কেন? এ তো তান্ত্রিক যন্ত্র হে!'

'সেটা কী?' আমি প্রশ্ন করলাম।

সিধুজ্যাঠা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কী সব চমক দিচ্ছ হে সকাল সকাল। শেক্সপিয়রের মন্ত্র থেকে তান্ত্রিক যন্ত্র, কিছুই তো বাদ দিচ্ছ না দেখছি!' বলে আলমারি থেকে একটা মোটা বই নামালেন। সেখান থেকে একটা অদ্ভুত আলপনা বের করলেন, ঠিক ফেলুদার আঁকা ছবিটার মতো।

'এই হল "যন্ত্র"। যে দেবীর পুজো করতে হবে সেই দেবীর জন্যই নির্দিষ্ট করা রয়েছে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের। বিভিন্ন দেবী বা শক্তির জন্য বিভিন্ন নিয়মে আঁকা যন্ত্র। এখন তো সব

পূজাতেই মূর্তি পাও, কিন্তু জানো তো, মূর্তিটা কিছুই না, আসল হচ্ছে এই যন্ত্র আর ঘট। শাক্ত-তান্ত্রিকদের বেশ কিছু জরুরি যন্ত্র আছে, সর্বতোভদ্রমণ্ডল, গণেশযন্ত্র, শ্রীরামযন্ত্র, নিত্যযন্ত্র, ত্রিপুর ভৈরবীযন্ত্র এইরকম। দেখো এখানে কী লিখছে... "যন্ত্র সাধারণত দুই প্রকার— পূজাযন্ত্র ও ধারণ-যন্ত্র। পূজাযন্ত্রে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, সেই দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হয়। ওইরূপ যন্ত্রকে পূজাযন্ত্র বলা হয়।

যে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ধারণ করা হয় তাহার নাম ধারণ-যন্ত্র। এই ধারণ-যন্ত্র ভূর্জপত্রে অঙ্কিত করিয়া ধারণ করিতে হয়।...

তন্ত্রে লিখিত আছে, যন্ত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, এইজন্য যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়।" যন্ত্রগুলো হল শক্তির এক একটা থান। ওই থানের ওপরে ঘট সাজিয়ে দেবতাকে ডাকলেই, তিনি এসে নাকি ওই পবিত্র পূর্ণঘটেরই জল আর পুষ্প-পত্রের মধ্যে জাগ্রত হন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বলেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা... তোমার এই সাহেব কি খুব হিন্দু ভক্ত ছিলেন?'

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ফেলুদা। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'নাহহহ। বরং উলটো। হিন্দু দেবদেবীদের গালি না দিলে নাকি তাঁর দু-বেলার ভাত হজম হত না।'

## ১৫

কেসটা নিয়ে ফেলুদা যে খুব চিন্তিত সেটা বোঝা যাচ্ছিল। সিগারেট খাওয়া বেড়ে গেছিল প্রচণ্ড। প্রায় সবসময়ই কপালে চারটে ঢেউ খেলানো দাগ। ঘরে থাকলে ঘন ঘন পায়চারি করছে বা সিলিং-এর দিকে চেয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে... আমিও

ফেলুদাকে বিশেষ ঘাঁটাতাম না। সেদিন যখন বাড়ি ঢুকল চোখ জ্বলজ্বল করছে। 'এইজন্যেই সব প্রমাণ নিজের চোখে দেখে নিতে হয়। গোয়েন্দাগিরির প্রথম শর্ত সেটাই। জানতাম, তবু যে এইরকম ভুল কেমন করে করলাম!'

'কী হয়েছে ফেলুদা?'

'সেই খামটা, যার মধ্যে কাগজে যন্ত্রটার ছবি ছিল, সেটা কী দিয়ে লাগানো ছিল মনে আছে?'

'কেন, তুমিই তো বলেছিলে, আলপিন...'

'এই... ঠিক এইখানে আমিও ভুল করেছিলাম। আমি পিনটা দেখিইনি। মৃত্যুঞ্জয় সোম যা বলেছেন বিশ্বাস করেছি। আজ কী মনে হতে দেখতে চাইতেই দেখলাম, আলপিন না। হ্যাটপিন। অ্যান্টিক হ্যাটপিন। ভিক্টোরিয়ার আমলে মহিলারা মাথার টুপি যে হ্যাটপিন দিয়ে লাগাতেন, সেই পিন।'

'কিন্তু সে-পিন চিঠিতে এল কীভাবে?'

'সেটা তুই ভেবে দেখ। মার্কাস সাহেব রাতে বাইরে বেরোতেন না। তাঁকে মাঝরাতে বাইরে বের করতে হলে এমন বার্তা পাঠাতে হবে যে আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারবেন না। সেইজন্য ওই যন্ত্রের ছবি। তাতেও যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তাই চিঠিকে আটকানো হয়েছিল সেই দুষ্প্রাপ্য হ্যাটপিন দিয়ে, যা দেখলেই মার্কাস বুঝবেন এ চিঠি ঠিক কে পাঠিয়েছে।'

'কিন্তু এই পিন তো খুব বেশি লোকের কাছে নেই এই শহরে!'

'সেটাই তো সুবিধা। শুধু তাই নয়, এমন দামি হ্যাটপিন যিনি সহজে হাতছাড়া করতে পারেন, তাঁর কাছে এই পিন আরও অনেক আছে। মানে...'

'অ্যান্টিক জিনিসের ব্যাবসাদার!!'

'শাবাশ তোপসে। এবার শুধু খুঁজতে হবে মার্কাস সাহেবের কোন বন্ধু অ্যান্টিকের ব্যাবসা করেন।'

পল জুব্রিস্কিকে জিজ্ঞাসা করতেই নাম বেরিয়ে এল। ক্রিস গ্রিফিথ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, অ্যান্টিক ডিলার, মার্কাসের পূর্বপরিচিত। হাতির দাঁতের ছুরিটাও তাঁরই সংগ্রহের। পুলিশি জেরার মুখে গ্রিফিথ তাঁর দোষ স্বীকার করেন। তিনিই চিঠি দিয়ে মার্কাসকে রাতে ডেকে এনেছিলেন। জানতেন এই হ্যাটপিন দেখলে মার্কাস সন্দেহ করবেন না। তিনিই মার্কাসের বুকে ছুরি বসিয়ে দেন। মোটিভ জানতে চাইলে ক্রিস জানায় অ্যান্টিকের ব্যাবসায় অনেকরকম বেআইনি কাজ করতে হয়। নতুন জিনিসকে পুরোনো বলে চালাতে হয়। তার কিছু কিছু জেনে গেছিলেন মার্কাস। পাছে পুলিশকে বলে দেন, তাই বাধ্য হয়ে ক্রিস মার্কাসকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মার্কাস কীভাবে তাঁর ব্যাবসার কথা জানলেন, কিংবা চিঠির সেই নকশাই-বা কেন... এসবের উত্তর দিতে ক্রিস সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। প্রতি মাসে মার্কাস কোথায় যেতেন, তাও নাকি সে জানে না। পুলিশ খুব চাপাচাপি করতে সে নাকি একটাই কথা বলেছিল, 'আমি তো সব স্বীকার করছি। দরকার হলে আমায় ফাঁসি দিন। এসব জানতে চাইবেন না। আমার মেয়ের বয়স মাত্র ছয়।'

সেই প্রথম একটা কেস সল্‌ভ করেও ফেলুদাকে বেশ অশান্ত দেখেছি। হাতে একটা পুরোনো ক্যালেন্ডার আর ডায়েরি নিয়ে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমাকে দেখিয়ে বলল, 'মার্কাস

সাহেবের রাতে বেরোনোর দিনগুলো দেখ, তোপসে! প্রতিটাই অমাবস্যার দিন। প্রতি মাসে ঠিক এই দিনে কোথায় যেতেন সাহেব? কিছু একটা ভুল হচ্ছে...মিসটেক! মিসটেক!!'

## ১৬

'কলকাতা ছাড়া আর কোথায় স্ট্র্যান্ড রোড, বড়োবাজার, বাগবাজার, বউবাজার আছে বল দেখি?' হাতের বইটা মুড়ে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

আমাকে একা পেলে মাঝে মাঝেই ফেলুদার মাস্টারি ভাবটা চাগাড় দিত। সেদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে সবে টিনটিনের *প্রিজনার অফ দ্য সান* বইটা নিয়ে পড়তে বসেছি। বইটা এতদিন ফেলুদার দখলে ছিল। আজ সকালেই শেষ করেছে। আয়েশ করে পড়তে যাব, এমন সময় বেমক্কা এই প্রশ্ন। আমি মাথা চুলকে বললুম, 'ভারতে?'

'ভারতে কী বলছিস? এই বাংলায়...'

'কোনো ইংরেজ উপনিবেশ-টিবেশ হবে।'

ফেলুদা *হযবরল*-র কাক্কেশ্বরের মতো মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, 'হয়নি, হয়নি, ফেল ফেল। কলকাতার খুব কাছেই আছে। ফরাশডাঙা। ইংরেজ না, ফরাসিদের উপনিবেশ।'

'নামটা কেমন চেনা চেনা ঠেকছে,' বলতেই ফেলুদা আমার মাথায় একটা জোর গাঁট্টা মেরে বলল, 'ইতিহাস বইটা কি শুধু ঘর সাজানোর জন্য? একটু পড়তেও তো পারিস। এককালে যাকে বলত ফরাশডাঙা, এখন তারই নাম চন্দননগর।'

এবার হাতের বইটা দেখতে পেলাম। ১৯৪০ সালে পূর্ববঙ্গের

রেলপথ থেকে প্রচারিত বই। নাম *বাংলার ভ্রমণ*। 'তুমি এতক্ষণ চন্দননগরের ইতিহাস পড়ছিলে?'

'আলবাত। একটা জায়গায় যাব আর তার ইতিহাস জেনে যাব না!'

'তুমি হঠাৎ চন্দননগর যাবে কেন? কোনো কেস এসেছে?'

'কী করে বুঝলি?'

'সকালেই পিয়োনকাকু এসে তোমায় একটা চিঠি দিয়ে গেল। তুমি পড়েই গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে গেলে। ফিরলে এই বইটা হাতে। শিয়োর সিধুজ্যাঠার থেকে এনেছ। এখন আবার এটা থেকে পড়া ধরছ আর বলছ চন্দননগর যাবে। তাই ভাবলাম নিশ্চয়ই কোনো ক্লায়েন্টের চিঠি।'

'যাক তোর ডিডাকশন কাজ করছে। ঠিকই বলেছিস। চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে দুটো বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া গেছে। চারদিন হল। পুলিশ এখনও খুনের কিনারা করতে পারেনি। ওখানকারই পৌরপিতা, নাম অমরেশ চ্যাটার্জি, চিঠি লিখে আমায় অনুরোধ করেছেন কেসটা দেখার জন্য। ভাবছি কাল যাব।'

'আর আমি?'

'যাবি তো চ। আর জটায়ুকেও একটা ফোন করে দে। লং ড্রাইভে উনি আর হরিপদবাবু থাকলে ভালোই হবে।'

জটায়ু তো এককথায় রাজি। 'চন্দননগর তো চেনা জায়গা মশাই। এককালে বছর বছর যেতাম জগদ্ধাত্রী পুজোতে। জাঁকজমক আর আলোতে কলকাতার দুর্গাপুজোকে হার মানায়।' পরদিন যেতে যেতে ফেলুদা বললে, 'শোন তোপসে, অনেককাল আগে খলিসানি, বোরো ও গোন্দলপাড়া নামে তিনটে প্রাচীন

মৌজা ছিল। এই তিনটে মৌজা আর গৌরহাটির ছিটমহল নিয়ে চন্দননগর শহর। মনসামঙ্গল ও কবিকঙ্কন চণ্ডীর লেখায় এ শহরের কথা আছে। লাক্ষা, মোম, সোরা, বেত, কাঠ, চন্দন কাঠ, বস্ত্রশিল্প, রেশম আর মশলার রপ্তানি ছিল এখানকার ব্যাবসা। তাই নাম চন্দননগর। ১৬৭৩ সালে ফরাসি দুপ্লে এখানে এসে একটা গুদামঘর তৈরি করেন বটে, তবে এর বেশি কিছু উন্নতি করতে পারেননি। পরে এক ফরমানের বলে ফরাসিরা গৌরহাটিতে একটি কুঠি আর লালদিঘির কাছে 'ডি-অঁরলিয়ে' দুর্গ তৈরি করেন। তবে যদি ভাবিস সেই দুর্গ দেখবি, সে-গুড়ে বালি। ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধে সেই দুর্গ ধ্বংস হয়ে যায়। ফরাসিরা নদীতীরে একটি পাটকলও শুরু করেন। এখানে দেখার মতো হল সেন্ট লুইস চার্চ, তিব্বতি মিশন চার্চ আর প্রাচীন বোরাই চণ্ডী মন্দির।'

চন্দননগরে ঢুকতেই বিশাল এক তোরণ। দারুণ সুন্দর রক্ষণাবেক্ষণ করা। ফেলুদা বলল ভারতে যখন ব্রিটিশ রাজ চলছে তখন চন্দননগর ছিল ফরাসি শাসনাধীন। তাই ব্রিটিশ পুলিশ তাড়া করলে এই তোরণ পার করে ফেলতে পারলেই নিরাপদ। তখনই অন্তত ধরপাকড় শুরু হবে না, কারণ সেটা অন্য দেশের জায়গির। আলিপুর বোমা মামলায় মূল অভিযুক্ত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ও অন্য বিপ্লবীরা নাকি চন্দননগরেই আশ্রয় নেন। এমনকী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় জড়িত গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, শহিদ জীবন ঘোষালরাও এখানে এসে লুকিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে একটু ঘুরে গিয়েই চন্দননগর পৌরসভা। পৌরপিতা অমরেশবাবু আমাদের জন্যই অপেক্ষা

করছিলেন। 'আরে আসুন, আসুন' করে আমাদের আপ্যায়ন করে বসালেন অফিস ঘরে। বেয়ারা নিয়ে এল জল আর প্লেটে করে বড়ো বড়ো সন্দেশ। হাসিমুখে অমরেশবাবু বললেন, 'এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি। সূর্য মোদকের দোকানের জলভরা সন্দেশ। এর পিছনে দারুণ এক গল্প আছে, জানেন! ১৮১৮ সালে কলকাতায় তখন জমিদাররাজ চলছে। ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ার ব্যানার্জিরা তখন ছিলেন বড়ো জমিদার। ব্যানার্জি বাড়ির মেয়ে যখন বিবাহযোগ্যা হলেন, বৈদ্যবাটির জমিদারবাবুর ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির হয়। তখনকার দিনে বিয়ের সময়ে জামাইকে ঠকানোর খেলা প্রচলিত ছিল। জামাইকে ঠকানোর জন্যে ভদ্রেশ্বরের জমিদারগিন্নিরা বিখ্যাত ময়রা 'সূর্যকুমার মোদক'-কে আদেশ দিলেন এমন এক মিষ্টি বানানোর, যা খেয়ে জামাইবাবাজি বোকা হয়ে যাবেন। সূর্যবাবু মাথা খাটিয়ে বের করেন এক আশ্চর্য বস্তু। এক বিরাট আকারের তালশাঁস বানিয়ে তার ভেতরে ভরে দেন সুগন্ধী গোলাপ জল। জামাই কামড়ও বসালেন আর গোলাপ জল বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পাঞ্জাবিটি ভিজিয়ে দেয়। সেই মিষ্টি নিয়ে সূর্যকুমার মোদক অমর হয়ে যান। মিষ্টির নাম হয় 'জলভরা'। জলভরার সঙ্গে অন্যান্য সন্দেশের তফাত হল— পেটে জল থাকা সত্ত্বেও কিন্তু জলভরা মাথা উঁচু করে সারাক্ষণ সটান দাঁড়িয়ে থাকে। সেই জায়গায় অন্য সন্দেশকে শুইয়ে রাখতে হয়।' যা বুঝলাম, ভদ্রলোক গপ্পো করতে ভারি ভালবাসেন।

অফিসে দেখলাম ফেলুদার চেয়ে জটায়ুর জনপ্রিয়তা বেশি। আমরা আসব খবর আগেই ছিল। অনেকেই দেখি অফিসের ব্যাগে করে জটায়ুর *করাল কুম্ভীর*, *দুর্ধর্ষ দুশমন* বা *সাহারায় শিহরন*

নিয়ে এসেছেন। একদল ভক্তর ভিড়ে জটায়ু হাসিমুখে সই বিলোতে শুরু করলেন। পরে অবশ্য একান্তে বলেছিলেন, 'এখন থেকে প্রতিমাসে এখানে আসব, বুঝলে তপেশ, খাসা জায়গা।'

ফেলুদার মন অবশ্য এসবের মধ্যেই ছিল না। ও সরাসরি অমরেশবাবুর সঙ্গে কাজের আলোচনায় এল।

'বডি দুটো কবে পাওয়া গেছে?'

'এই তো গত বুধবার। অগাস্টের একুশে।'

'কোথায়?'

'স্ট্র্যান্ডে গঙ্গার ধারে।'

'বডি শনাক্ত করা গেছে?'

'না। তবে দুটোই বাচ্চা ছেলের। শরীরে এক টুকরো কাপড় নেই।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ। তাই শনাক্ত করা যাচ্ছে না।' অমরেশবাবুর গলা প্রায় ফিসফিসে হয়ে এল, 'আরও একটা জিনিস নেই। প্রচণ্ড ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে নিপুণভাবে ওদের মাথা দুটো কেটে নেওয়া হয়েছে।'

## ১৭

ফেলুদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের কাছে গেল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ওর গলার স্বর কাঁপছে। 'এদিকে দেখে যা তোপসে। গত মঙ্গলবার, কুড়ি তারিখ কৌশিকী অমাবস্যা ছিল। মার্কাস সাহেবের বেরোনোর দিনগুলো মনে কর।' আমিও অবাক।

'চলুন তো, কোথায় বডি দুটো পাওয়া গেছিল, দেখব।'

আমরা তিনজন লালমোহনবাবুর গাড়িতে আর অমরেশবাবুরা অফিসের একটা জিপে রওনা হলাম স্ট্র্যান্ডের দিকে। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার। বাড়িঘর একটু অন্যরকম। ফেলুদা বলল ফরাসিদের প্রভাব। হুগলি নদীর তীর বরাবর দারুণ সাজানো একটা রাস্তা চোখে পড়ল। এটাই নাকি স্ট্র্যান্ড। গাড়ি থেকে নেমে অমরেশবাবুর পিছন পিছন আমরা এগিয়ে গেলাম ঘাটের দিকে।

'এইটুকু রাস্তাতে অনেক কিছু দেখার আছে,' বলতে বলতে চলছিলেন অমরেশ চ্যাটার্জি। ওই যে দুপ্লের বাড়ি, এখন অবশ্য মিউজিয়াম হয়েছে। আর ওই যে, দূরে দেখতে পাচ্ছেন একটা বাড়ি প্রায় জলের লেভেলে... ওটার নাম পাতালবাড়ি।'

সত্যি এমন অদ্ভুত বাড়ি আগে দেখিনি। মাটির সমতল থেকে নেমে বাড়িটা যেন জলে গিয়ে মিশেছে।

'বুঝলে খোকা,' বলে চললেন অমরেশবাবু, 'বহু প্রাচীন এই বাড়িটির নীচের তলাটি এখন গঙ্গার জলতলের নীচে। জ্যোতিদাদা ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে কিশোর রবি ঠাকুর কিছুদিন এই বাড়ির পাশে তেলেনিপাড়ার বাঁড়ুজ্যেদের বাগানবাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে গেছিলেন মোরান সাহেবের মাটির বাড়িতে। সেই দুটো বাড়ি এখন আর নেই। পরে ১৯৩৫ সালে রবি ঠাকুর এই পাতালবাড়িতে এসে ওঠেন। রবি ঠাকুরের খুব পছন্দের মিষ্টি ছিল সূর্য মোদকের দোকানের জলভরা সন্দেশ, এখানে এলে সেই মিষ্টি নিয়ে আসা হত। বিদ্যাসাগর মশাইও মাঝেমধ্যে এই বাড়িতে এসে উঠতেন। একবার তো বিধবা বিবাহ প্রচলন উপলক্ষে বেশ কিছুদিন এখানে থেকে চন্দননগরের বাসিন্দাদের
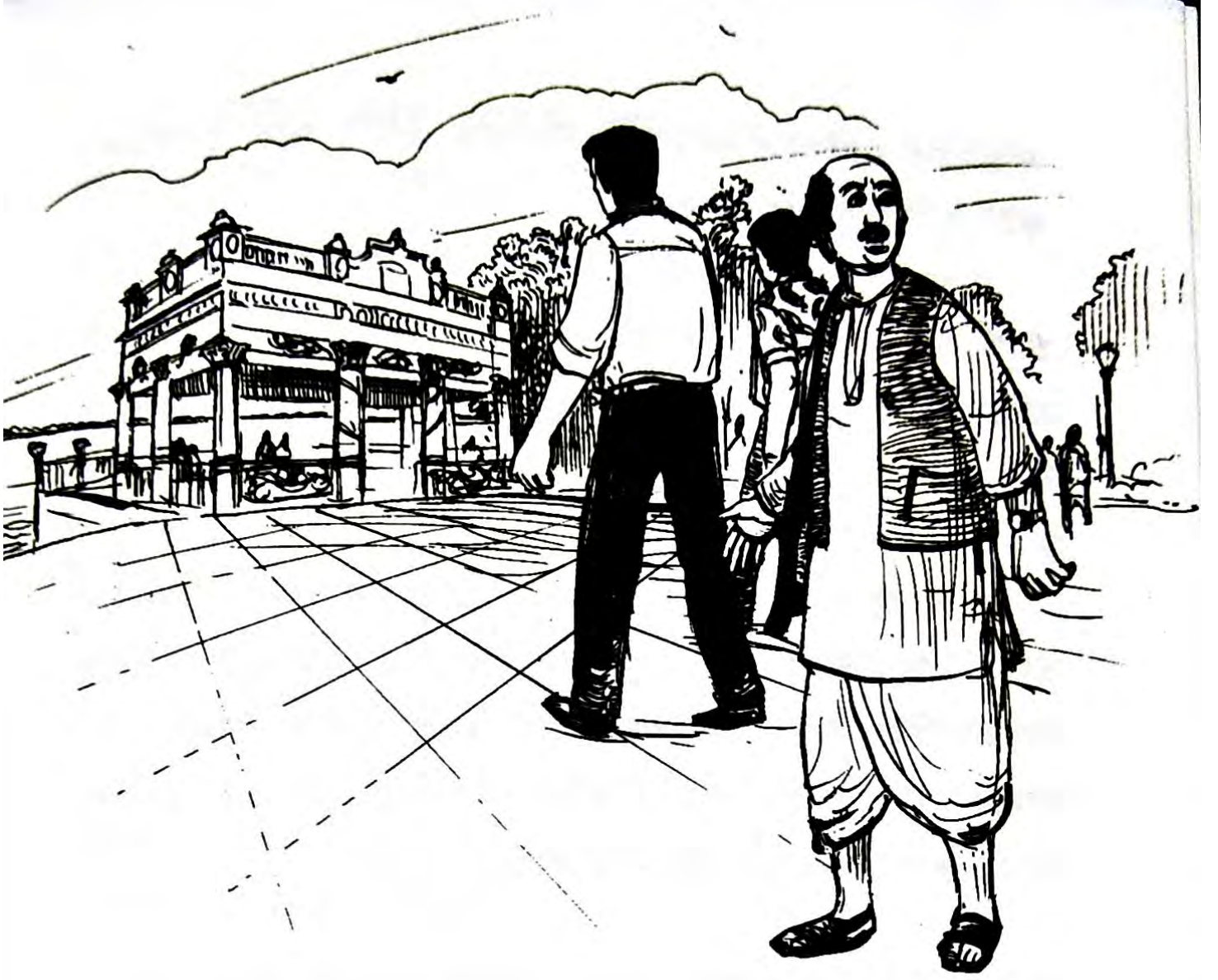
সাহায্য চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু সমাজে প্রথম বিধবা বিবাহ শুরু হয় চন্দননগরের খলিসানিতে, জানো নিশ্চয়ই।'

ফেলুদার মুখ দেখেই বুঝছিলাম এসব কথা ওর কানে একটাও ঢুকছে না। হাঁটতে হাঁটতে ঘাটে পৌঁছোলাম। ঘাটের ঠিক শুরুতেই বিশাল গেট। সেখান থেকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে সিঁড়ি।

'এই সিঁড়ির ধাপেই মুন্ডুহীন দেহ দুটো পড়ে ছিল। আর সিঁড়ির ধাপে সিঁদুর দিয়ে অদ্ভুত একটা চিহ্ন আঁকা ছিল।'

'কী চিহ্ন?'

'আগে দেখিনি কখনো। পুলিশ ছবি তুলে নিয়ে গেছে।

আমাদের অফিসের বড়োবাবু দীপকও একটা ছবি তুলেছিল। কই হে দীপক, এনাদের দেখাও ছবিটা...'

সঙ্গের ভদ্রলোক যেন এই কথারই অপেক্ষা করছিলেন। হলুদ একটা ফাইল খুলে 'এই যে, স্যার' বলে বড়ো একটা ছবি আমাদের সামনে ধরলেন। ছবি দেখে আমার মুখে এত বড়ো হাঁ হয়ে গেছিল যে মাছি তো বটেই, একটা টুনটুনি পাখি অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে।

আমাদের সামনের ছবির চিহ্নটা আমাদের চেনা। কিছুদিন আগেই দেখেছি। যদিও যেখানে দেখেছি তার সঙ্গে এই জায়গার কোনো মিল নেই। আমি মাথামুন্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। ছবিতে সেই যন্ত্র। মার্কাস সাহেবের পকেটে ঠিক যেমনটি পাওয়া গেছিল।

১৮

'আপনাদের এখানে ইদানীং কোনো বাচ্চা চুরি গেছে?' ফেলুদা জানতে চাইল।

'সে তো থানার লোক ভালো বলতে পারবে... কিন্তু আমার কানে আসেনি কিছু।'

'এই জোড়া খুনের কথা কে কে জানে?'

এবার মৃদু হাসলেন অমরেশ চ্যাটার্জি। 'দেখুন প্রদোষবাবু, এটা তো আর কলকাতা নয়, ছোটো জায়গা। এখানে খবর ছড়াতে সময় লাগে না। মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ে। লোককে জানাতে পত্রিকা লাগে না...'

'মানে, প্রায় সবাই জানে।'

'হ্যাঁ, জানে। আর এতেই সমস্যা বেড়েছে। অপজিশন ক্রমাগত আমাদের ওপর চাপ তৈরি করছে। আমাকে পদত্যাগ করতে বলছে। সাধে কি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি?'

'একটু পুলিশ স্টেশনে যাব,' ফেলুদার কথা শুনে পৌরপিতা ভদ্রলোক বেশ হতাশই হলেন। সেই পুলিশেই যদি যেতে হয়, তবে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কেন? ফেলুদা বললে পুলিশের কাছে অনেকরকম খবর থাকে যেগুলো জোগাড় করা প্রাইভেট ডিটেকটিভের পক্ষে ভয়ানক কঠিন।

চন্দননগর থানার ওসি বিপিন তলাপাত্র ফেলুদার নামের সঙ্গে পরিচিত। এই কেস নিয়ে তিনিও বেশ ভাবিত বেশ বোঝা গেল। 'নয় দশ বছরের ছোটো ছোটো ছেলেদের সঙ্গে কার কী শত্রুতা থাকতে পারে মশাই, সেটাই বুঝতে পারছি না। এভাবে কেউ খুন করে?'

'ফরেনসিক কী বলছে?'

'সেটা তো আরও আশ্চর্য। দুটো মৃতদেহেই অত্যাচারের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। মারার আগে কোনোরকম কষ্ট দেওয়া হয়নি ছেলে দুটোকে। আরও অবাক কাণ্ড ছেলে দুটোর ফুসফুসে কড়া নেশার জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটুকু ছেলে এই বয়েসেই কেন অমন নেশা ধরেছিল কে জানে!'

'যুগের হাওয়া!' পাশ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লালমোহনবাবু।

'কীরকম নেশার জিনিস?' ফেলুদা কথা বলছে আর ছোট্ট একটা কাগজে নোট নিচ্ছে।

'আফিম জাতীয়। দুটো ফুসফুসেই ভরে আছে।'

গাড়ি চেপে বাড়ি ফেরার সময় ফেলুদা একটাও কথা বলল

না। জটায়ু কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন। ফেলুদার মুখের ভাব দেখে সাহস করলেন না। বাড়ি ফিরে ফেলুদা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, 'মার্কাস সাহেবের চিঠির চিহ্ন চন্দননগরে কীভাবে গেল? নয় দশ বছরের ছেলেরা কেন আফিঙের নেশা করে? ক্রিস গ্রিফিথের ভয়টা কীসের বা কাদের? আলাদা আলাদা অনেকগুলো সুতো চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। সবকটা কি এক জায়গায় মিশেছে? নাকি... কিচ্ছু ভালো লাগছে না রে তোপসে... কিচ্ছু ভালো লাগছে না।'

## ১৯

পরের সপ্তাহের গোটাটা আমি স্কুল নিয়ে ব্যস্ত রইলাম আর ফেলুদা কেস নিয়ে। ও নাকি আবার ফরডাইস লেনে যাচ্ছে। একদিন সন্ধেবেলা আমি নীলুকাকাদের বাড়ি থেকে ফিরছি, এমন সময় নিজেই আমাকে ঘরে ডাকল।

'তোপসে, দেখে যা...'

দেখলাম ওর হাতে একটা লাল খেরোর খাতা। ঠিক যেমন খাতায় আগেকার দিনে হিসেব লেখা হত।

'এটা কী ফেলুদা?'

'মার্কাস সাহেবের হিসেবের খাতা। ওঁর আলমারিতে ছিল। ভাইপোর থেকে চেয়ে এনেছি। এবার এই দেখ। জাবদা খাতার মতো মার্কাস তাঁর প্রতি মাসের আয় আর ব্যয়ের হিসেব রাখতেন। বাঁ-দিকে আয়, ডান দিকে ব্যয়। ব্যয়ের হিসেবটা দেখলেই বুঝবি রীতিমতো আয়েশ করে কাটাতেন ভদ্রলোক,

যেমনটা পল বলেছিলেন। এবার আয়টা দেখ। শেষ ছয় মাসের প্রতি মাসে বেতনের মতো দশ হাজার করে টাকা যোগ হয়েছে। সঙ্গে কোথা থেকে টাকাটা এসেছে সেটা লেখা। গত ছয় মাসেই টাকাটা দিয়েছে এস এল এম নামে কেউ।'

'দশ হাজার!! সে তো অনেক টাকা!'

'কিন্তু ভদ্রলোক কোনো কাজ করতেন না। সেটাও মাথায় রাখিস। মজার ব্যাপার একমাত্র এই নামটাই সাঁটে লেখা। এঁর আগের সব নাম গোটাটা লিখেছেন মার্কাস। এবার এন্ট্রির তারিখগুলো দেখ।'

দেখলাম, কিন্তু কোনো বিশেষত্ব চোখে পড়ল না। ফেলুদা সেটা বুঝতে পেরে আরও একটা কাগজ আমার সামনে মেলে ধরল। এতেও বেশ কিছু তারিখ লেখা।

'এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখ তো! এগুলো মার্কাস যেদিন যেদিন বেরোতেন সেদিনের তারিখ।'

আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। যেদিন যেদিন রাতে বেরিয়েছেন তার পরের দিনই খাতায় দশটি হাজার টাকা যোগ হয়েছে। অর্থাৎ মার্কাসের নৈশ অভিযান ছিল টাকা আনার জন্য।

'আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। এই হিসেবের খাতা শুরু হচ্ছে আজ থেকে তিন বছর আগে। মানে যবে থেকে মার্কাস উকিলের কাজ ছাড়লেন। তাহলে কি মার্কাস অন্য কোনো উপায় জেনেছিলেন যাতে আরও বেশি রোজগার করা যায়? দেখতে হচ্ছে... দাঁড়া, পলকে একটা ফোন করি। এখন বাজে সন্ধে সাড়ে সাতটা। হোটেলে ওঁর বাজানো শুরু হয় আটটা থেকে। হোটেলেই পাব।' বলে ফেলুদা পাশের ঘরে চলে গেল ফোন করতে।

বেশ খানিক বাদে ফিরে এসে বলল, 'চ তো তোপসে, একটু বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় যাবে?'

'ফ্যান্সি লেনে। উকিল সত্যলব্ধ মজুমদারের কাছে। ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিলাম।'

'ইনি আবার কে?'

'সেই উকিল যার কাছে মার্কাস কাজ করতেন। পল হদিশ দিল।'

বেরোনোর সময় কেন জানি না ফেলুদা রিভলভারটা পকেটে গুঁজে নিল। আমারও কেমন একটা গা ছমছম করতে লাগল।

## ২০

বি বা দী বাগের কাছে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট-এর বাঁ-হাতে যে ছোটো রাস্তাটা বেরিয়েছে সেটাই ফ্যান্সি লেন। রাস্তায় ঢুকতে ঢুকতে ফেলুদা বলল, 'এই যে মোড় দেখছিস, জোব চার্নকের আমলে এখানেই ছিল এক ফাঁসির মঞ্চ। *প্যারোকিয়াল অ্যানালস* আর *পেরিশ অব বেঙ্গল* বইতে আর্চডিকন হাইড সাহেব বলেছেন, সেই মঞ্চটা নাকি একটি গাছের সঙ্গে লাগানো ছিল। ভেবে দেখ। সামান্য অপরাধেও বহু মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয় এই মঞ্চে। মহারাজা নন্দকুমারকেও এখানেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই ফাঁসি থেকেই ফ্যান্সি নামটা এসেছে। এর ঠিক পাশ দিয়েই বয়ে যেত একটা সরু খাল। সেই খাল পশ্চিমে গিয়ে গঙ্গায় মিশত। খাল বা ক্রিক থেকেই পরে রাস্তার নাম ক্রিক রো হয়েছে।'

ফ্যান্সি লেনে উকিল সত্যলব্ধ মজুমদারের ঘরে ঢুকেই আমার সেই ভাবটা হল যেটা কিছুদিন আগে নরেশ পাকড়াশীর ঘরে

ঢুকে হয়েছিল। ছাদ অবধি উঁচু দেওয়াল আলমারি। আলমারি ঠাসা বই। অবশ্য এখানে সব বইই আইন সংক্রান্ত। থর হেয়ারডাল বা স্বেন হেদিনের বই খুব সম্ভব একটাও নেই। তবে এই ভদ্রলোকেরও মুখে ব্রায়ার রুট পাইপ, সামনে টাইপরাইটার, গাল ভাঙা, বয়স ষাটের কাছাকাছি আর চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। সেই চশমার ওপর দিয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়েই ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'আপনিই প্রদোষ চন্দ্র মিত্র?'

গলার আওয়াজে এমন কিছু একটা ছিল, যা আদালতে শুনলে ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ফেলুদা দেখি দিব্যি 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলে সামলে নিল।

'তা, এই বুড়োর কাছে আগমন কী উদ্দেশ্যে?'

'আজ্ঞে আপনার এক কেরানি, নাম মার্কাস জুব্রিস্কি, তাঁর সম্পর্কে কিছু জানার ছিল।'

'সে তো তিন বছর হল আমার চাকরি ছেড়েছে। ছেড়েছে না বলে আমিই তাড়িয়েছি বলা ভালো। তারপর থেকে কোনো যোগাযোগ নেই। তবে সেদিন আনন্দবাজারে দেখলুম সে নাকি খুন হয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকটা সেই কারণেই আসা।'

'কিন্তু, খুনি তো ধরা পড়েছে, খুন স্বীকারও করেছে। আবার কী?'

'আসলে অন্য একটা কেসের ব্যাপারে কিছু তথ্য দরকার। খুব সম্ভব সেটা এই কেসের সঙ্গে যুক্ত।'

'তা বলুন, কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'মার্কাস কেমন মানুষ ছিলেন?'

'যদি দক্ষতা নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তবে ওর মতো দক্ষ আর

কাজ জানা লোক পাওয়া মুশকিল। তবে সৎ ছিল না একেবারেই। টাকার প্রতি দারুণ লোভ। দু-বার আমিই হাতেনাতে ধরেছিলাম। আসলে মাইনে দিতাম মাসে দেড় হাজার। ও যেমন আয়েশে চলত তাতে ওই টাকায় কিস্সু হত না। শেষে একবার আমার সই জাল করে চেক সই করতে গিয়ে ধরা পড়ল। তখনই তাড়িয়ে দিলাম।'

'এই চিহ্নটা দেখেছেন কখনো?' ফেলুদা পকেট থেকে সেই যন্ত্রর ছবির কপিটা বের করল।

আমার যেন স্পষ্ট মনে হল, ভদ্রলোক চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'নাঃ, জীবনে দেখিনি।'

'এবার দয়া করে এই নামগুলো দেখুন তো...' বলে ফেলুদা জুব্রিস্কির হিসেবের খাতার প্রথমদিকের পাতাগুলো বাড়িয়ে দিল। কারো কাছ থেকে দু-হাজার, কারো কাছ থেকে তিন হাজার করে টাকা নিয়েছেন মাঝে মাঝেই। নামগুলো দেখে সত্যপ্রিয়বাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর খুব ধীরে ধীরে বললেন, 'উকিল আর মক্কেলের এক অলিখিত চুক্তি থাকে জানেন তো। সেটা হল গোপনীয়তার চুক্তি। সে-চুক্তি তো ভাঙতে পারি না, তবে এটুকু বলছি, এরা সবাই আমার পরিচিত। এরা সবাই আমার কাছে ঋণী। এবার আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। বুঝে যাবেন।'

'আচ্ছা, এমন কাউকে আপনি চেনেন যার আদ্যক্ষর এস এল এম? এঁর থেকে মাসে মাসে দশ হাজার করে টাকা নিত মার্কাস।'

খানিক ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'এই মুহূর্তে তো মনে পড়ছে না মিত্রবাবু... আপনার ফোন নম্বরটা দিয়ে যান। পরে মনে পড়লে বলব।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে প্রথমেই ফেলুদা যে কথাটা বলল, সেটা হল, 'ব্ল্যাকমেল। মার্কাসের লোভ ছিল প্রচণ্ড আর সেনবাবুর সব মক্কেলের নাড়িনক্ষত্র ওর জানা ছিল। জানত কে কে সত্যি সত্যি অপরাধ করেছে। মাসের পর মাস তাদের ব্ল্যাকমেল করে টাকা রোজগার করত। এই এস এল এম-এর সঙ্গে আলাপের পর মার্কাসকে আর জনে জনে ঘুরতে হয়নি। এ একাই দশ হাজার করে টাকা দিয়ে গেছে। তারপর সহ্যের সীমা ছাড়ালে মার্কাসকে খুন করেছে।'

'কিন্তু মার্কাসকে তো ক্রিস খুন করেছে ফেলুদা...'

মুখ দিয়ে একটা চিক চিক শব্দ করে ফেলুদা বললে, 'তুই বোড়েটাকে দেখছিস, আর আমি রাজার কথা ভাবছি।' যেতে যেতে দেখলাম, আমরা বেরোতেই উকিলবাবু সামনে রাখা ফোনের ডায়াল ঘোরালেন।

## ২১

পরদিন সকালেই ফোনটা এল। আমিই ধরলাম।

'আমি ইনস্পেকটর হরেন মুৎসুদ্দি বলছি। প্রদোষবাবু আছেন?'

'দিচ্ছি,' বলে ফেলুদার ঘরে গিয়ে দেখি তখনও যোগাসন চলছে। শেষ হতে সাড়ে তিন মিনিট বাকি। তবু বললাম, 'ইনস্পেকটর হরেন মুৎসুদ্দির ফোন। পরে করতে বলব?'

ফেলুদা সঙ্গেসঙ্গে উঠে 'দাঁড়া, ধরছি' বলে ফোন ধরতে গেল। আমি একদিকের কথাই শুনলাম, তবু পরে ফেলুদার থেকে বাকিটাও শুনে নিয়ে দু-জনের কথাই লিখছি।'

'বলুন, ইনস্পেকটর।'

'মৃত মানুষের টেবিলে আপনার ভিজিটিং কার্ড কেন?'

'কে মারা গেল আবার?'

'ফ্যান্সি লেনে, উকিল সত্যলব্ধ মজুমদার। গতকাল রাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। নিজের স্টাডিরুমে। ঠিকে কাজের লোক ভোরে এসে দেখতে পেয়েই পুলিশকে জানায়। স্টাডি টেবিলে দেখলাম পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া আপনার ভিজিটিং কার্ড। চিনতেন নাকি ভদ্রলোককে?'

'চিনতাম বললে ভুল হবে, গতকাল একটা কেসের ব্যাপারে দেখা করতে গেসলুম।'

'ক-টায়?'

'সন্ধে আটটা নাগাদ হবে। আমি একবার যাব ওখানে?'

'চলে আসুন।'

আমি আর ফেলুদা বারো ঘণ্টার মধ্যে আবার একই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই এক ঘর, বইয়ের তাক, কিন্তু কোথাও যেন এক চরম বিষণ্ণতা, যেটা কাল ছিল না। আমরা যখন গেলাম, ততক্ষণে বডি নামানো হয়ে গেছে। শুইয়ে রাখা হয়েছে পাশের একটা চৌকিতে। সাদা চাদরে ঢাকা। ঢুকেই ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'বাড়িতে আর কেউ থাকত না?'

'না। স্ত্রী মারা গেছেন মাস ছয় আগে। একমাত্র মেয়ে কানপুরে থাকে। তাকে খবর পাঠানো হয়েছে।'

'আত্মহত্যার কারণ কিছু জানা গেল?'

'নিজেই লিখে গেছেন। টাইপরাইটারে। লিখে সেই চিঠি সেখানেই ছেড়ে গেছেন।'

'সেটা দেখা যায়?'

'তা যাবে না কেন? তবে কী, আপনি এই গ্লাভসটা পরে ধরুন। বোঝেনই তো ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপার...'

'সে তো বটেই, তবে আপনি আর একটা কাজ করুন তো, গণেশবাবু। টাইপরাইটারে আঙুলের ছাপটাও একটু দেখে নিন।'

গণেশ মুৎসুদ্দি কাউকে একটা নির্দেশ দিতে গেলেন, সেই ফাঁকে আমরা চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। পরিষ্কার টাইপ করা চিঠি, তাতে লেখা,

'আমি ধরা পড়ে গেছি। প্রদোষবাবু আমায় ধরে ফেলেছেন। আমি বহুদিন ওকালতির পাশাপাশি নানারকম অ্যান্টিসোশ্যাল কাজে যুক্ত। আমার স্ত্রী এই কথা জানতে পেরে গেছিল। তাই তাকে খুন করতে বাধ্য হই। ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হওয়ার জন্য অপরাধ চাপা দিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু মার্কাস সেদিন কোনো কারণে আমার বাড়ি এসেছিল। ও আমার অপরাধ দেখে ফেলে। তারপর আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। আমিও মজবুর হয়ে ওকে টাকা দিতে থাকি। তারপর সীমা ছাড়ালে ক্রিসকে দিয়ে ওকে খুন করাই। ভেবেছিলাম কেউ জানবে না। কিন্তু আজ প্রদোষবাবু এস এল এম-এর খোঁজ করতেই আমি বুঝে গেলাম কি, আজ হোক বা কাল আমি ধরা পড়বই। আমি এ জীবন রাখতে চাই না। তাই সজ্ঞানে সুইসাইড করছি।'

'এস এল এম তাহলে সত্যলব্ধ মজুমদার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বুঝতে পারছি না রে, তোপসে। খাঁটি উত্তর কলকাতার বাঙালির লেখায় এত উর্দু আর ইংরেজি শব্দ কেন? বাক্যের গঠনই-বা এমন অদ্ভুত কেন? কোথাও তো একটা গোলমাল আছে...'

ইনস্পেকটর গণেশবাবু ততক্ষণে চলে এসেছেন। ফেলুদা তাঁকেই প্রশ্নটা করল, 'আচ্ছা গণেশবাবু, এই সত্যলব্ধ উকিলের স্ত্রী কীভাবে মারা গেসলেন?'

'আগুনে পুড়ে। স্টোভ বার্স্ট করেছিল। একটা এনকোয়ারি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কিস্সু পাওয়া যায়নি। ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। দুর্ঘটনা।'

'কিন্তু চিঠি তো তা বলছে না... সত্যলব্ধ মজুমদারের বডিটা দেখতে পারি?'

'কেন নয়?'

ফেলুদা খুব মন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বডিটা দেখল। গলায় দড়ির দাগ খুব কাছ থেকে দেখে একটু অবাক হল যেন। তারপর মৃতের পায়ের কাছে এসেই 'এ কী! ডান পায়ের নখ তো উপড়ে গেছে' বলেই মুখ দিয়ে বার দুই 'ইস! ইস!' করল। সব শেষে ও দড়িটা দেখতে চাইল। দড়ি দেখেই ওর চোখ জ্বলে উঠল। তারপর নীচু হয়ে টেবিলের পায়ার কাছটা পরীক্ষা করল। যখন মাথা ওঠাল, সেই ফেলুদাকে আমি চিনি। ও কিছু একটা ক্লু পেয়েছে। চাপা গলায় ইনস্পেকটরকে বলল, 'ভুল করবেন না, গণেশবাবু। এটা আত্মহত্যার কেসই নয়। পিয়োর অ্যান্ড সিম্পল মার্ডার। উকিলবাবুকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।'

## ২২

ঘরে একটা পিন পড়লেও বুঝি শব্দ পাওয়া যেত। প্রথম কথা বললেন ইনস্পেকটর মুৎসুদ্দি।

'আপনি কী করে এত কনফার্ম হচ্ছেন? উনি তো সুইসাইড লেটার লিখে গেছেন।'

‘ভুল। লেখেননি, টাইপ করেছেন। আপনার টাইপরাইটার থেকে আমি টাইপ করলে সেটা কি আর আপনার লেখা বলা যায়? আপনি টাইপরাইটারে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করান, আমি নিশ্চিত কোন ছাপ পাবেন না। খুনি যাওয়ার আগে সযত্নে সেটা মুছে দিয়ে গেছে। মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করান। ওঁকে মেরে তারপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মারা হয়েছে রুমাল জাতীয় কিছু দিয়ে দমবন্ধ করে। সেই রুমালের মাঝে একটা গিঁট ছিল। গলার দাগটা ভালো করে খেয়াল করুন। উকিলবাবু চেয়ারে বসে হাত পা ছুড়তে থাকেন। পা টেবিলের কোনায় লেগে নখ উপড়ে যায়। খানিক বাদে তিনি মারা যান।

তারপর ওঁর গলায় দড়ি বাঁধা হয়। একজন ওঁর অজ্ঞান দেহ তুলে ধরে, অন্যজন ছাদের কাছে লাগোয়া লোহার কড়ি দিয়ে দড়ি গলিয়ে কপিকলের মতো টানতে থাকে। এই টানতে গিয়েই দড়ির অনেকটা জায়গায় ঘষার দাগ লাগে। আপনি খেয়াল করলে কড়িতেও দড়ির অংশ পাবেন। তখনই ঘাড় ভেঙে ওঁর মৃত্যু হয়। আর এই টানাটানি করতে গিয়ে উকিলবাবুর ভারী মেহগনি কাঠের টেবিলটা সরে যায়। আপনি মেঝের দাগ দেখুন। এই যে, সামনের বাঁ-দিকের পায়াটা কেমন সরে গেছে। আমি যদি খুব ভুল না করি তাহলে এই পায়াতেই ভর দিয়ে বডিটা ওঠানো হয়েছিল।’

‘কী বলছেন মশাই!’

‘ঠিকই বলছি। আমরা চলে যাবার সময় উকিলবাবু কাউকে ফোন করছিলেন। দুটো ব্যাপার হতে পারে। এক, তাঁকে সাবধান করতে, দুই, তিনিও মার্কাসের মতো ব্ল্যাকমেলের রাস্তা বেছে নেন। কারণ যেটাই হোক, সে-লোক এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সে একা এল না। সঙ্গে ষণ্ডা প্রকৃতির কাউকে নিয়ে এল। তৈরি হয়ে এল। এসপার নয় ওসপার। প্রথমে উকিলবাবুর সঙ্গে কথা চলল, এই টেবিলে বসে। কথার ফাঁকে যে অন্যজনকে কোনো সংকেত দিল, আগেকার দিনের ঠগিরা যেমন ঝিরনি দিত। সঙ্গী উকিলের পিছনে গিয়ে তাঁকে দমবন্ধ করে খুন করল।'

'কে এই লোক?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না ইনস্পেকটর মুৎসুদ্দি। তবে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, ফরডাইস লেনের খুন, চন্দননগরের জোড়া খুন আর এই ফ্যান্সি লেনের খুন, সবকটা সুতো এক জায়গায় বাঁধা। সুতোতে টান পড়ছে, আর তাই সুতোর মালিক নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হচ্ছে। রামায়ণের ইন্দ্রজিতের মতো মেঘের আড়ালে থেকে কেউ একটা যুদ্ধ চালাচ্ছে। কে সে? কেনই-বা এসব করছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। আর যতক্ষণ সেটা বোঝা না যাচ্ছে, আমার শান্তি নেই।'

## ২৩

ফ্যান্সি লেনের কেসটা মিটতে-না-মিটতে ফেলুদাকে পুরো অন্যরকম একটা কেসে জড়িয়ে পড়তে হল। আর সেই কারণে আমাদেরও প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হল কলকাতায়। মানিকবাবু সে-কাহিনি লিখেছেন 'গোরস্থানে সাবধান' অভিযানে। এরপরে প্রায় মাস দুই ফেলুদার হাতে কোনো কেস ছিল না। তা বলে ও বসে ছিল ভাবলে ভুল হবে। ও সারাদিনই প্রায় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত। কাছেই বস্তির লোকজন আর ভিখারিদের সঙ্গে কথা বলত। ওদের টাকাপয়সাও দিত। একদিন অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করাতে

বলেছিল ওর গুরু শার্লক হোমসও নাকি এমনটা করতেন। লন্ডনের রাস্তার ছেলেদের নিয়ে তাঁর এক বাহিনী ছিল, নাম বেকার স্ট্রিট ইরেগুলারস। ফেলুদাও ঠিক তেমনি একটা দল তৈরি শুরু করল। তাতে চোদ্দো পনেরো বছরের ছেলে থেকে একেবারে ছোটো সাত আট বছরের বাচ্চাও ছিল। এদের বেশিরভাগ রাস্তায় ভিক্ষে করে। কেউ দোকানে কাজ করে, দু-একজন পকেটমারও নাকি আছে। ফেলুদা ওদের একটা কাজেই লাগিয়েছিল। খোঁজ নিতে, কোথাও কোনো শিশু বা কিশোর আচমকা নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে কি না। এই ভিখারিদের দলের পাণ্ডা ছিল বছর পঁচিশের একজন। ওর আসল নাম কেউ জানে না। সবাই 'ভাই' বলে ডাকে। ছোটোরা ভাইদাদা। একদিন দেখি আমাদের বৈঠকখানায় ভাই বসে ফেলুদার সঙ্গে কী সব আলোচনা করছে। ভাই চুইনগাম চিবোতে চিবোতে বলছিল, 'কী বলব স্যার, ওসব জায়গায় খোঁজ নেওয়া খুব মুশকিল। পুলিশও ওখানে ঢুকতে ভয় পায়।'

'কেন, গুন্ডার ভয়?'

'না স্যার। গুন্ডা তো আছেই। কিন্তু ওরা আমাদের ভিখারিদের অ্যাসোসিয়েশনকে ঘাঁটায় না। আমি যাদের কথা বলছি, ওদের গুন্ডারাও সমঝে চলে।'

'কারা?'

'কাপালিক, স্যার। কাপালিক। খুব ডেঞ্জার... ওদের দলটায় ইদানীং খুব বাড়বাড়ন্ত। কারা সব পয়সা ঢালছে বাইরে থেকে।'

'বল কী? তুমি কী করে জানলে?'

'আমরা সব জানতে পারি, স্যার। শুধু চুপচাপ থাকি। মাঝে ছেলেধরা বেড়েছিল খুব। পুলিশও কিছু বলত না। হপ্তা পেত তো

ওদের থেকে। তারপর কে একজন এই নিয়ে পেপারে কী সব লিখল। এখন বেশ কয়েকদিন ওরা চুপচাপ আছে। চিৎপুরে ওদের ডেরা, কিন্তু ঠিক কোথায়, কেউ জানে না।'

ফেলুদা পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বলল, 'এটা রাখো। আর খবর নেওয়ার চেষ্টা করো। খবর পেলে আরও পঞ্চাশ।'

ভাইয়ের কালো কালো দাঁতগুলো বেরিয়ে এল প্রায় সবকটাই, 'দেখছি, স্যার। দেখছি। এখন আসি তবে...' বলে ভাই চলে যেতেই ফেলুদাও বেরোনোর জন্য তৈরি হতে লাগল।

'কোথায় যাবে?'

'সিধুজ্যাঠার কাছে। যাবি তো চল।'

. . .

'বুঝলে হে ফেলুচাঁদ, বাস্তবে কোনো সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীই নিজেকে "কাপালিক" বলে ঘোষণা করেন না। তান্ত্রিকরা তো ননই। পুরাণ অনুযায়ী, ত্রিজগতে একজনই "কাপালিক"। তিনি স্বয়ং শিব। "শিবপুরাণ" থেকে জানা যায়, ব্রহ্মার সৃষ্টিতে মহাদেব মোটেই খুশি ছিলেন না। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি নিয়ে যথেষ্ট গর্ব পোষণ করতেন। এই গর্ব থেকেই চতুর্মুখ ব্রহ্মার শিরে আরও একটি মুণ্ড দেখা দেয়। শিব এই মুণ্ডটি কেটে ফেলেন। পরে ব্রহ্মা তাঁকে জানান, সব কিছু সৃষ্টি করলেও তিনি দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করেননি। জীবজগতের অজ্ঞতাই তাদের দুর্দশার জন্য দায়ী। শিব অনুতপ্ত হন। এবং তাঁর ওপরে ব্রহ্মহত্যার পাপ এসে লাগে। প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি ব্রহ্মকপালে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে শুরু করেন। সেই থেকে তিনি "কাপালিক" নামে পরিচিত হন,'

বলে চায়ের কাপে একটা চুমুক লাগালেন সিধুজ্যাঠা।

'তবে কলকাতার কাপালিক সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। কলকাতার জন্মের আগে থেকে এদের দল রয়েছে। বলতে গেলে ভারতের অন্যতম প্রাচীন সিক্রেট সোসাইটি এই কাপালিকদের দল। আজ যেখানে চিৎপুর, সেখানে এককালে ছিল গভীর জঙ্গল। কোল দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই শেয়ালের ডাকে গা ছমছম করে। সেখানে চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে পুজো করত চিতে ডাকাতের দল। চারদিকে মশাল। মশালের আলোয় কামারের হাতের খাঁড়া ঝকমক করছে। প্রতি অমাবস্যায় এক একটি মানুষকে নরবলি দেওয়া হত। চার্নক সাহেব তখনও গঙ্গার পাড়ে নৌকো বাঁধেননি। কলকাতায় কালী-চর্চার সেই হল প্রথম পর্ব।

'চিত্রেশ্বরীর মন্দিরের কোল দিয়ে একটি সরু রাস্তা বরাবর চলে গিয়েছিল দক্ষিণের দিকে। লাল দিঘি পেরোলেই ছিল গহন বন। সেখানে ভীষণ ডাকাতের ভয়। আর তার থেকেও ভয় বাঘের। ডিহি কলকাতা ছাড়িয়ে সে-পথ গিয়েছিল কালীঘাট পর্যন্ত। এই এক কালী ছিলেন, আর ছিলেন কালীঘাটের কালী। দু-শো বছর আগেও এ পথ ছিল। হলওয়েল সাহেব দেখেছিলেন এটি। এ পথের কথায় তিনি লিখেছিলেন, "দি রোড লিডিং টু কালীঘাট অ্যান্ড ডিহি ক্যালকাটা।" দিনের বেলা সে-পথে যেতে লোকের গা ছমছম করত। আর রাতে তো কথাই নেই। পালকিওয়ালারাও সওয়ার নিতে সাহস করত না। আর যদি-বা নিত, অনেক লোকলশকর জোগাড় করতে হত তাদের। মশাল হাতে আগে আগে দৌড়োত মশালচিরা। সঙ্গে থাকত পাইক বরকন্দাজ। মোটকথা, মেলা খরচ। তবে অনেকেই বলে এই কালীঘাটের কালীর আদিনিবাস নাকি

প্রথম থেকে ওখানে ছিল না। তিনি চিত্রেশ্বরীর কাছাকাছিই ছিলেন। গঙ্গার ওপরেই ছিল মন্দির। জঙ্গলে ঘেরা। মন্দিরের কোণে একটি দেওয়াল। পোস্তা বাঁধানো। পাছে পড়ে যায় তাই মজবুত করা। ভক্ত ও দর্শনার্থীদের দল আসত মাঝে মাঝে। বাঁধানো পোস্তার ওপর বসত। এরপরে এখানে বসে বসে কেনাবেচাও আরম্ভ হয়ে গেল। বসল হাট। পরে হাটটাই উঠল জোরালো হয়ে। দেবী হারিয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে একদিন পড়ে গেল মন্দির। পোস্তার হাটে যে মায়ের মন্দির ছিল সকলে তা ভুলেই গেল।

'ভুলল না সেই কাপালিকের দল। হঠাৎ একদিন তারা এসে হাজির। ভাঙা মন্দির খুঁজে তাঁরা দেবীর মুখ্য প্রস্তরটি খুঁজে বের করল। তারপর সেটা নিয়ে তারা চলে গেল দক্ষিণের জঙ্গলে। সেই সময়ে এক সন্ন্যাসী ছিলেন জঙ্গলের ভেতর। তাঁর নাম জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গি। আজকের চৌরঙ্গি তাঁর নাম থেকেই। কেউ বলেন ওই সন্ন্যাসী ছিলেন শৈব। কেউ বলেন তান্ত্রিক। সন্ন্যাসী পূজা করলেন মাকে। তারপর জঙ্গলগিরি চলে যান গঙ্গাসাগর। যাবার সময় এক শিষ্যের ওপর পুজোর ভার দিয়ে গেলেন।'

'তাহলে আজকের কালীঘাট হল কীভাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সে আর এক ইতিহাস। বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীরা আবিষ্কার করলেন এই কালীকে। এককালে তাঁদের কুলদেবতা ছিলেন শ্যামরায়। আবিরের আভায় দোলের দিন শ্যামের উৎসবে দিঘির জল উঠত লাল হয়ে। তা থেকে একালের লালদিঘি। এরপর এলেন শ্যামা মা। শ্যামার পূজায় পাঁঠার রক্তে কালীঘাটের পথ পিচ্ছিল হয়ে উঠল। সাবর্ণ চৌধুরীরা জাঁকজমকে মায়ের পূজা

আরম্ভ করে দিলেন। পুজোর দায়িত্ব নিল হালদার পুরোহিতরা। শ্যামা স্থায়ী ঠিকানা পেলেন কালীঘাটে।'

'কিন্তু কাপালিকদের শুনেছি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল,' এবার ফেলুদা মুখ খুলল।

'সে তো বটেই। কাপালিকদের আরাধনার একটা বড়ো অংশ ছিল নরবলি। শক্তি সাধনায় নরবলি না হলে নাকি পুজো শেষ হয় না। তাই ইংরেজ আমলে লুকিয়ে-চুরিয়ে শিশুচুরি হত। ১৮৩১ সালে ইংরেজরা এই কাপালিকদের সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেন। রাতারাতি তারা কোথায় হারিয়ে গেল কেউ জানে না। মাটি যেন ওদের গ্রাস করে নিল। কিন্তু সত্যি কথা বলি ফেলুচাঁদ, আমি এই ঘরে বসে মনের জানলা দরজা খোলা রাখি। আমি তোমায় বলছি, কাপালিকরা আজও আছে। এই শহরের মধ্যে আরও একটা শহর আছে। তার খবর আমরা কেউ জানি না ফেলু...'

## ২৪

মাঝে কিছুদিন ফেলুদাকে কলকাতার বাইরে থাকতে হল। প্রথমেই ডাক পড়ল খড়গপুর থেকে। একই বাড়ির দুই যমজ ভাই খুন হয়েছে। একই দিনে শহরের দুই প্রান্তে দুই ভাইকে কেউ বা কারা খুন করে। বড়োভাই অচিন্ত্য বেরাকে খুন করা হয়েছে রাস্তায় ছুরি মেরে, আর ছোটোভাই অনন্ত খুন হয়েছেন নিজের দোকানে বসে, রিভলভারের গুলিতে। দুটো খুনের মধ্যে তফাত মাত্র ঘণ্টাখানেকের। তদন্ত করতে গিয়ে ফেলুদা দেখে ছোটোভাই অনন্ত জড়িয়ে পড়েছিলেন খড়গপুরের ওয়াগন ব্রেকারদের চক্রে। কিন্তু তাঁর গতিবিধি ধরা যেত না। বড়োভাই

কোনো ঝামেলায় না থাকলেও ছোটোভাইকে সাহায্য করতেন, অন্যভাবে। দুই ভাই একরকম চুলের ছাঁট দিতেন, একরকম পোশাক পরতেন, কে কোথায় যাবেন সেটা আগে থেকে তাঁরা ছাড়া কেউ জানত না। অনন্তর ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছিল। খড়গপুরের দোকানদারদের নিয়মিত টাকাপয়সা দিয়ে তাকে শান্ত রাখতে হত। কিন্তু ব্যাপারটা আস্তে আস্তে সহ্যের সীমা ছাড়াল। বাজার সমিতির সভাপতির ছেলে সুশীল জানা একজন ভাড়াটে গুন্ডা ঠিক করে অনন্তকে খুন করতে। কিন্তু মুশকিল একটাই। দুই ভাইয়ের কে অচিন্ত্য আর কে অনন্ত, তা বাড়ির লোকেরাই বুঝতে পারত না। ভাড়াটে খুনির পক্ষে বোঝা অসম্ভব। ফলে একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুই ভাইকেই মরতে হবে। দুই ভাইয়ের কাছে খবর ছিল কিছু একটা ঘটতে পারে। তাই ছোটোভাইয়ের বদলে বড়োভাই অচিন্ত্য সেদিন বিকেলে স্টেশন বাজারে আসেন, ছোটোভাই দোকানে ছিলেন। খড়গপুর স্টেশনে ঢোকার মুখে অচিন্ত্যকে অনন্ত ভেবে ছুরি মেরে খুন করে ব্রিজের তলায় লাশ ফেলে রাখা হয়। তারপর খুনি চলে যায় সোজা পুরোনো বাজারে। অনন্ত তখন অচিন্ত্য সেজে দোকান সামলাচ্ছেন। খুনি দোকানে এসে সরাসরি 'অনন্তবাবু, একটা কথা ছিল' বলায় অনন্ত বেখেয়ালে 'কী কথা' বলতেই খুনি প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে অনন্তকে গুলি করে বন্দুক সেখানেই ফেলে চলে যায়। দেশি বন্দুক। এই ধরনের বন্দুককে ওয়ান শটার বলে। ফেলুদা টানা এক সপ্তাহ খড়গপুরে থেকে তদন্ত চালিয়ে সুশীল জানাকে ধরে। ভাড়াটে গুন্ডাটি অবশ্য অন্য রাজ্যের হওয়ায় তার টিকিটিও ছোঁয়া যায়নি। খুন করে, টাকা নিয়ে সে হাপিশ হয়ে গেছিল।

'এই কেসটা মানিকবাবুকে বলিস না। এই গল্পগুলো কিশোররাই পড়ে তো... ওদের মনে বাজে প্রভাব পড়বে।' ফিরে এসে বলেছিল ফেলুদা। আর ঠিক এই কারণেই যেসব কেসে কোনোরকম প্রাপ্তবয়স্ক উপাদান থাকত, ও আমায় নিতে চাইত না। পাটনায় জাল উইলের কেসটা যেমন। জমিদারের রক্ষিতার ছেলে জমিদার অভয়নাথ পরাশর মৃত্যুর পর কোর্টে এক উইল দাখিল করে। তাতে সমস্ত সম্পত্তি তিনি নিজের ছেলেকে না দিয়ে, দিয়ে গেছেন সেই রক্ষিতার সন্তানকে। এই নিয়ে পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল। শেষে জমিদারের নিজের ছেলে পরেশনাথ, ফেলুদাকে ডেকে পাঠান। ফেলুদার কথা তাঁকে বলেছিলেন ইনস্পেকটর পুরন্দর পাণ্ডে। ব্যোমকেশবাবু ততদিনে কেস নেওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। তাই ফেলুদাকেই এই কেসের দায়িত্ব নিতে হয়। ফেলুদা উইল দেখেই নাকি বলে দেয় সে-উইল জাল। ইনস্পেকটর পাণ্ডে অবাক হয়ে যান।

'কী করে বলছেন প্রদোষবাবু? জমিদারের ছেলের উইলে রাজাবাবুর যে সই আছে, সেটার চেয়ে তো অন্যটায় সই অনেক বেশি পরিষ্কার।'

'মানুষ উইল করে শেষ বয়েসে। তখন হাতের লেখা কাঁপতেই পারে। কিন্তু হাতের লেখা যতই কাঁপুক, একটা জিনিস কোনোদিনও বদলাবে না।'

'সেটা কী?'

'আপনি রাজাবাবুর এই সইটা দেখুন। ব্যাঙ্কের থেকে পাওয়া। এবার একটা স্কেল নিয়ে আসুন।'

আনা হলে ঠিক মাস্টারের ভঙ্গিতে ফেলুদা স্কেল দিয়ে মাপা

শুরু করল। 'যা বলছিলাম, মানুষের সই এক অদ্ভুত জিনিস। হাতের লেখা যতই বিকৃত হয়ে যাক, গোটা সইয়ের দৈর্ঘ্য কখনো বদলায় না। এবার দেখুন। ব্যাঙ্কের থেকে পাওয়া সইটা, লম্বায় ৫.২ সেন্টিমিটার। রাজার ছেলের থেকে পাওয়া সইতে লেখা একটু এঁকেবেঁকে গেছে। কিন্তু সই লম্বায় ৫.৪ সেন্টিমিটার। বয়স হলে হাত কেঁপে এতটুকু বাড়তেই পারে। কিন্তু এই জাল উইলের সইটা দেখুন।' ফেলুদা স্কেল ধরতেই পাণ্ডে যা বোঝার বুঝে গেলেন। সই মাত্র ৩.৯ সেন্টিমিটার লম্বা। মাত্র একবেলায় এই কেসের সমাধান করে ফেলুদার খুব নামডাক হয়েছিল। কিন্তু পরে পাটনা থেকে আরও কেসের অফার এলেও ও নেয়নি। বলত, 'এখানেই যা চাপ, তারপর পাটনার সব কেস নিতে শুরু করলে শখ আহ্লাদ সব জলাঞ্জলি দিতে হবে।'

এর একমাস পরেই ওকে আবার একবার পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের রাজগড়ে একটা খুনের মামলায় যেতে হল। রাজবাড়িতে রাজার পুত্রবধূকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেখানকার পুলিশ মহাদেব মণ্ডল ফেলুদাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনিই ফেলুদাকে ডেকে পাঠান।

তখনই ফেলুদার মুখে শুনি প্রাচীন বঙ্গে তাম্রলিপ্ত বন্দরে যখন রমরমিয়ে বাণিজ্য চলছে তখনও মহিষাদল নাকি সমুদ্রগর্ভে। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক অবদিও মহিষাদলে কোনো জনপদ গড়ে ওঠেনি। ধীরে ধীরে পলি পড়ে চর, জঙ্গল তৈরি হয়। তারপরই এখানে বসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। আর জনপদের খ্যাতি বাড়ে এই মহিষাদল রাজপরিবারের হাত ধরে। মহিষাদলের নামকরণ নিয়ে বহু জনশ্রুতি রয়েছে। কেউ বলেন, জনপদের

আকার মহিষের আদলের মতো ছিল। তাই নাম মহিষাদল হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে বসতি গড়ে ওঠার প্রথম দিকে মাহিষ্য জাতির আধিক্য ছিল। তাই এই এলাকার নাম মহিষাদল। কারো মতে এখানে বহু মহিষ বিচরণ করত, তাই এমন নাম। এই এলাকার কয়েকটি মৌজাকে নিয়ে ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় মহিষাদলের পত্তন হয়।

মহিষাদল রাজবাড়ির কেসে গোটা বাড়ি পরীক্ষা করতে গিয়ে ফেলুদা ঠাকুরঘরের ঠিক নীচে একটা নতুন বাঁধানো সিঁড়ির ধাপ খুঁজে পায়। হয়তো সন্দেহ হত না, কিন্তু বাকি ধাপগুলো এত পুরোনো আর ফাটল ধরা যে একেবারে চকচকে একটা ধাপ খুব সহজেই ওর নজরে পড়েছিল। জমিদার মশাইকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। ফেলুদার কথায় ধাপ ভেঙে ছেলের বউয়ের বেশ কয়েক টুকরো করে কাটা দেহ উদ্ধার হয়। পণ নিয়ে একটা গণ্ডগোল বিয়ের পর থেকেই চলছিল, সেটার পরিণতি যে এত ভয়ানক হবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। খুব স্বাভাবিকভাবে এই কেসটাও মানিকবাবু তাঁর অভিযানের তালিকায় রাখতে পারেননি।

লখাইপুরের জোড়া খুন, ধলভূমগড়ের জোড়া খুনের ব্যাপারে ও আমাকে কোনোদিন কিছু বলেনি। বিশেষ করে প্রথমটা নিয়ে। এমনকী আমার তো সন্দেহ হয়, আদৌ লখাইপুর নামে কোনো জায়গা আছে কি না। যতদূর জানি শিশু আর নারী পাচারের একটা চক্রের সন্ধান পেয়েছিল ফেলুদা। তাদের কাজকর্ম ফাঁস করতে গিয়ে এমন কিছু জেনে ফেলেছিল আর দেখে ফেলেছিল যা জীবনে আমার সামনে বলতে পারেনি ও। আমিও তা নিয়ে চাপাচাপি করিনি।

রাঁচি এক্সপ্রেসে চড়ে ধলভূমগড়ে ও একবার গেছিল, জানি। সেখানে একদিনের মধ্যে দুই ভদ্রলোকের মৃতদেহ পাওয়া যায় রেললাইনের ধারে। প্রায় একই জায়গায়। প্রথমজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুন্দর চৌবে, আর দ্বিতীয়জন স্থানীয় রোমিও অরুণ দুবে। প্রথমজনকে মাথায় লোহার রডের বাড়ি মেরে খুন করা হয়েছে, আর দ্বিতীয়জনকে বিষ দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে দু-জনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। ফেলুদা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। ওকে বহুবার বলতে শুনেছি, বিষ হল মেয়েদের হাতিয়ার। ও সেই পথেই তদন্ত শুরু করল। আর তা করতে গিয়ে আবিষ্কার করে এক বীভৎস নোংরা প্লট। সুন্দর চৌবের স্ত্রী সুনীতা অনেকদিন ধরেই তাঁর স্বামীর ম্যানেজার আশুতোষ পরাশরের সঙ্গে প্রেম করতেন। কিন্তু ভয় ছিল ধরা পড়ার। তাই অরুণকে সুনীতা মিথ্যে প্রেমের জালে ফাঁসালেন। বললেন সুন্দরকে খুন করলে গোটা সম্পত্তি সুনীতার আর সুনীতা তারপর বিয়ে করবেন অরুণকে। বেকার অরুণ এই ফাঁদে পা দেয়। তার কাছে সুন্দরের স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেমের প্রমাণ আছে, এই কথা বলে সুন্দরকে নিয়ে আসে রেললাইনের ধারে, নির্জন জায়গায়। তারপর মাথায় রডের বাড়ি মেরে খুন করে। সুনীতার পথের একটা কাঁটা দূর হয়। দ্বিতীয় কাঁটা দূর করা আরও সোজা। অরুণকে একান্তে ডেকে নেন সুনীতা। তারপর কোনো এক অছিলায় বিষ মেশানো ঠান্ডা পানীয় খাইয়ে খুন করেন অরুণকে। ভাবতেও পারেননি এত দূর থেকে প্রদোষ চন্দ্র মিত্র নামে এক গোয়েন্দা এসে তাঁর সব ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবে।

সব কেস চলছিল, কিন্তু ফেলুদা সেই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা

বন্ধ করেনি। ভাই প্রায়ই আসত। সোজা ঢুকে যেত ওর ঘরে। দরজা বন্ধ করে কীসব যেন আলোচনা করত। বুঝতাম, ও বড়ো কোনো এক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে, আর সে-ব্যাপারটা এতই গোপন যে আমার সঙ্গেও আলোচনা করা যায় না।

## ২৫

১৯৭৫ সালের জানুয়ারির সেই সকালটা আমি ভুলব না। রবার্টসনের রুবিটা মিউজিয়ামে জমা পড়ার পরের দিন। আমি সবে খেয়ে-দেয়ে কলেজে বেরোব, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। আমিও 'যাচ্ছি' বলে দরজা খুলে দেখি বছর দশ এগারোর একটা ছেলে। পরনে ময়লা স্যান্ডো গেঞ্জি, কালো হাফ প্যান্ট, খালি পা, গালে একটা লাল জড়ুল। ভিখারি নাকি? ভাবতেই রিনরিনে গলায় বলে উঠল, 'তুমি কি ফেলুদা?' আমি মাথা নেড়ে না করতেই আবার বলল, 'ফেলুদাকে একটু ডেকে দাও না... ওরা ছোটুকে নিয়ে গেছে। ফেলুদাকে বলো না হাবুকে খুঁজে দিতে...'

এমন ক্লায়েন্ট ফেলুদা আগে কখনো পায়নি। ওকে ডাকতেই আলোয়ান জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ছেলেটাকে ভেতরে বসাল। ছেলেটা প্রথমে সোফায় না বসে মাটিতেই বসতে যাচ্ছিল। আমিই ওকে সোফায় বসালাম। ঠান্ডায় কাঁপছে। 'তোপসে, চট করে এক গেলাস গরম দুধ আর বিস্কুট নিয়ে আয় তো ভেতর থেকে...', ফেলুদা বলল। এনে ছেলেটার হাতে দিতে ঢক ঢক করে গোটা দুধটা খেয়ে ও তার কথা শুরু করল। ছেলেটার নাম ফ্যালা। বাবা ছোটোবেলায় মারা গেছেন। মা বাড়ি বাড়ি কাজ করেন। থাকার মধ্যে আছে এক ভাই। নাম হাবু।

তিনজনে মিলে আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে যে বস্তিটা আছে, সেখানেই থাকে। ফ্যালা আর হাবু দু-জনে মিলে সারাদিন কাগজ কুড়োয়। গত পরশু সে আর তার ভাই ঘুমিয়ে ছিল। সকালে উঠে দেখে ভাই নেই।

'মা ছিল না তোদের সঙ্গে?' ফেলুদা জিজ্ঞাসা করল।

ফ্যালার কথায় জানা গেল, তার মা প্রায়ই রাতে ফেরে না। ফেরে ভোরবেলায়। খানিক ঘরের কাজ করে আবার ঠিকে ঝির কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে। ফেলুদার মুখ থমথমে। শিশু দুটোর খাবার জোগান দিতে শুধু যে ঝি-বৃত্তি যথেষ্ট নয়, আরও কিছু রাত্রিকালীন কাজ করতে হয়, তা স্পষ্ট। অন্যদিনের মতো

সেদিনও তাদের মা সকালে ফিরে আসে। হাবুকে দেখতে না পেয়ে ভাবে কোথাও বেরিয়েছে। সন্ধ্যার পরও যখন হাবু ফিরল না, তাদের মা কান্নাকাটি শুরু করল। কেউ কেউ বলল পুলিশে খবর দিতে। পুলিশ ডায়েরি নিল ঠিকই কিন্তু হাবুকে খোঁজার কোনো উৎসাহই দেখাল না।

'কী করে বুঝলি হাবুকে কেউ নিয়ে গেছে? নিজে পালিয়ে যায়নি?' ফেলুদা বলল।

'কয়েক মাস আগে পলুকেও নিয়ে গেছিল যে! পলু আর ফেরেনি। ওর ঘরের সামনেও সিঁদুরের দাগ ছিল। ওরা একরকম দাগ আমাদের ঘরের সামনেও রেখে গেছে।'

ফেলুদার দুই ভুরু কুঁচকে একেবারে ধনুক হয়ে গেছে। মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে। 'আমার নাম তুই জানলি কী করে?'

'একটা পুলিশকাকুই বলল। বলল পুলিশে কিছু করবে না। আমি করতে চাইলেও করতে দেবে না। তুই ফেলুদার কাছে যা। ও-ই তো তোমার বাড়ির পথ বলে দিল।'

'তোপসে, আজ কলেজে ডুব মারতে পারবি? চল তো ঘুরে আসি ওর সঙ্গে...'

আমিও এক পায়ে খাড়া। ফ্যালার পিছন পিছন আমরা যে জায়গায় গেলাম, তার পাশ দিয়ে বহুবার গেলেও কোনোদিন ভেতরে ঢুকিনি। খাপরা আর খোলার ঘর। যেন এক্ষুনি ভেঙে পড়বে। পাশে ড্রেন থেকে উৎকট গন্ধ আসছে। চারিদিকে ছড়ানো নানা প্রাণী আর মানুষের বিষ্ঠা। তার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে একটা ছোট্ট ঘরের সামনে দাঁড়াল ফ্যালা। 'এই আমাদের ঘর।'

ঘরের ঠিক পাশে রাস্তার একধারে সিঁদুর আর তেল দিয়ে আঁকা অদ্ভুত একটা চিহ্ন। এ চিহ্ন আমাদের চেনা। মার্কাস সাহেব থেকে চন্দননগর... এই চিহ্ন আমরা দেখেছি।

'এসব কী ফেলুদা?' আমি বললাম।

ফেলুদা গম্ভীর। 'বিপদ একেবারে ঘাড়ের সামনে নিশ্বাস ফেলছে রে! চন্দননগরের ঘটনাটার পর পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছিল। ফলে এরাও কিছুটা দমে যায়। আবার শুরু হয়েছে।'

ঠিক কী শুরু হয়েছে মাথায় ঢুকছিল না। জিজ্ঞাসা করার সাহসও ছিল না। চারমিনারটা ধরিয়ে পকেট থেকে নোটবইটা বের করে নকশাটা মিলিয়ে নিল ফেলুদা। তারপর ফ্যালার দিকে তাকিয়ে যেন একটু জোর করেই হেসে বলল, 'কিচ্ছু ভাবিস না, ফ্যালা। হাবুকে এনে দেবই।'

. . .

বাড়ি ফিরেই সোজা ক্যালেন্ডারের কাছে চলে গেল ফেলুদা। আঙুল দিয়ে আমায় দেখাল, 'পরশু অমাবস্যা, তোপসে। মানে হাতে আর মাত্র দুটো দিন। দাঁড়া, ভাইকে ডেকে পাঠাই।'

ভাই এসেই অদ্ভুত একটা খবর দিল। এর মধ্যে সে নাকি কাপালিকদের দলের সন্ধান পেয়েছে। সেই দলে নাকি ওদের একজন আছে। তার সঙ্গে সে একদিন গেছিল ওদের মাসিক অধিবেশনে। ওকে নাকি একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার সেটা পালন করতে হবে।

'ওরা কোথায় দেখা করে?'

'কালীঘাটে। পুরোনো বাজারে।'

'দেখতে কেমন?'

'শার্ট প্যান্ট পরা। ভদ্রলোকের মতোই। একজন তো কোটও পরে এসেছিল। হাতে সুটকেস।'

'দলের পাণ্ডা কে? বুঝলে?'

'বোধ হয় পেরেছি। ইনি অবাঙালি। কিন্তু বাংলা বলতে পারেন। কুর্তা পায়জামা পরেন। বয়স বেশি না। কুড়ি একুশ হবে। কিন্তু সবাই এঁকে ভয় পায়।'

'নাম জানলে?'

'নাহ। তবে কেউ কেউ এঁকে হুজুর আর কেউ কেউ সুলেম বলে ডাকছিলেন।'

'সুলেম?'

'তাই তো শুনলাম। এই সুলেম ছেলেটা ভয়ংকর। ও চায় ক্ষমতা, আর চায় শয়তানকে বশে আনতে।'

'আর তোমাকে যে লিস্টটা আনতে বলেছিলাম, এনেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার। এই যে।' বলে কোঁচকানো একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল ভাই।

ফেলুদা অনেকক্ষণ ধরে সোফায় ডান পায়ের উপর বাঁ-পা তুলে কাগজটা দেখল। হাতের চারমিনার পুড়ে ছাই। সেদিকে ফেলুদার ভ্রূক্ষেপও নেই। তারপর বলল, 'তোপসে, এই দেখ। এই হল গত এক বছরের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে বাচ্চা ছেলেমেয়ে হারানোর হিসেব। খেয়াল করে দেখ জায়গাগুলো... কলাবাগান, গরানহাটা, খিদিরপুরের বস্তি অঞ্চল... যেখানে বাচ্চারা মা বাবার নজরে থাকছে না, বা হারিয়ে গেলেও সঙ্গেসঙ্গে টের পাওয়া যাচ্ছে না, সেখান থেকেই বাচ্চা চুরি যাচ্ছে। মানে অরক্ষিত শিশু... ভালো লাগছে না রে তোপসে...'

তারপর ভাইকে বলল, 'ওরা তোমায় আর আসতে বলেছে?'

'হ্যাঁ। পরশুদিন। সেদিনই আমার দীক্ষা হবে।'

আমি আর ফেলুদা দু-জনেই চমকে উঠলাম। পরশুই তো অমাবস্যা!

'তোমায় কী-একটা নিয়ে যেতে বলেছে বললে...'

'সেটা বলা যাবে না, স্যার। আপনারা যাবেন সেদিন? যদি যান তখনই দেখবেন বরং।'

'আমরা দু-জন যাব।'

'যাবেন স্যার। বাড়ি এসে নিয়ে যাব। ঠিক রাত আটটায়। পরশু।'

ভাই বেরিয়ে গেল।

ঠিক এই সময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে পান চিবোতে চিবোতে যে নামল, তার বয়স কুড়ি পেরোয়নি। কিন্তু চেহারাটা বড্ড চেনা চেনা। গায়ে জহর কোট। পরনে কুর্তা-পাঞ্জাবি। মুখের হাসিটাও যেন আগে কোথায় দেখেছি। ফেলুদার মুখ দেখলাম। একটু অবাক হলেও সামলে নিয়েছে। প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল, 'সুরজলাল?'

'চিনতে পেরেছেন তবে মিত্তির আঙ্কেল? সেই বেনারসে দেখা হয়েছিল। রুকুর বাড়িতে। তারপর পিতাজিকে তো আপনি জেলে ঘুসিয়ে দিলেন। আমাদের একটা পতা ভি করলেন না...'

এবার চিনেছি। সুরজলাল মেঘরাজ। মগনলালের ছেলে। দেখেই বোঝা যায়, ছেলে বাপের চেয়েও বড়ো শয়তান হয়েছে। কিন্তু এ এখানে কেন?

'তোমায় কি তোমার বাবা পাঠালেন?' ফেলুদা বলল।

একটা কুৎসিত হাসি হেসে সুরজ বললে, 'পিতাজির তবিয়ত ঠিক নাই। দিনরাত মকানেই থাকেন। কাজ কাম হামিই সামলাই। পিতাজি কুছু জানেন না। হামি নিজের মর্জিতেই এসেছি।'

কারো তোয়াক্কা না করে সোফায় বসে অভদ্রের মতো পা দোলাতে দোলাতে সুরজ বলল, 'এবার বলেন তো মিত্তির আঙ্কেল, বস্তিতে কার কোন ছেলে হারাল তাতে আপনার এত সরদর্দ কেনো? ওরা তো আপনাকে ফিজ ভি দিতে পারে না। আমার কোথা শোনেন, ওসব জায়গা ভালো নাই। আপনাকে হামি পাঁচ হাজার রুপেয়া দিচ্ছি। আপনি এসোব বন্ধ করেন।'

ফেলুদা চুপ।

'দশ হাজার আঙ্কেল.. আপনার এক সালের আয়।'

ফেলুদা এবার অদ্ভুত হেসে বলল, 'তোমার বাবা আমায় কিনতে পারেননি সুরজ, তুমি তো সেদিনের বাচ্চা।'

'কুড়ি হাজার মিত্তির আঙ্কেল। আমার শেষ অফার।'

'না, সুরজ। যেখানে একটা বাচ্চা শিশুর জীবন জড়িয়ে, সেখানে আমাকে তদন্ত চালাতেই হবে।'

যেন বিষাক্ত এক সাপ ফোঁস করে উঠল। 'পিতাজি পারেন নাই এমন অনেক কাজ আমি পারি, মিত্তির আঙ্কেল। আপনাকে এখুনি খুনও করতে পারি। কিন্তু ভালোভাবে বাতচিত করতে এসেছি। আপনাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম। কেস বন্ধ করুন। নইলে পস্তাবেন।'

'কেস আমি চালাবই সুরজ।'

'এই আপনার শেষ কোথা?'

'শেষ কথা।'

'বেশ, পোরে যা যা হোবার হবে। আমায় দোষী করবেন না এই বলে দিলাম। জয় মা।'

ঝড়ের মতো চলে গেল সুরজলাল। ফেলুদা অদ্ভুতভাবে সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'সুরজলাল মেঘরাজ। এস এল এম... সুলেম... সব মিলে যাচ্ছে রে তোপসে।'

'মার্কাস সাহেব ছিলেন উকিল সত্যলব্ধর কেরানি। কিন্তু প্রচণ্ড লোভী। কেসের ফাইল নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি বুঝে যেতেন কে সত্যিকারের অপরাধী আর কে নয়। উকিলের সামনে সবাই সত্যি কথা বলে। সেই অপরাধের প্রমাণও বোধ করি উকিলের কাছে ছিল। সেইসব প্রমাণ নিয়ে তাঁদের ব্ল্যাকমেল করতে থাকেন মার্কাস। আর এভাবেই কখনো সুরজলালের ফাইলটা তাঁর হাতে আসে। সুরজ বীভৎস কোনো গর্হিত কাজ করে সেটা তিনি জানতেন। ফরডাইস লেনের ক্রিস খুব সম্ভব সুরজের দলের লোক। তাঁর সূত্রেই মার্কাস সব কিছু জানতে পারেন। জেনে তিনিও সুরজদের অমাবস্যার অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য চাপাচাপি করতে থাকেন। আর যোগ দিয়ে এমন কিছু দেখেন যা তাঁর রোজগারের রাস্তা খুলে দেয়। তিনি সুরজলালকে মাসিক দশ হাজারের কড়ারে ব্ল্যাকমেল করতে থাকেন। মাসে একবার তিনি সেই অধিবেশনে যেতেন, আর ভাগের টাকা বুঝে নিতেন। সুরজ একা এত টাকা দিত না হয়তো। দলের সবাই মিলে দিত। আর হিন্দুদের দু-চোখে দেখতে না পারা মার্কাস সাহেব কালীকে 'ডার্ক লেডি' বলে ডাকতেন। তাঁর ভাইপো ভাবতেন সত্যিকার কোনো মহিলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। জটায়ু গাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ফেলুদা মানা করল। 'এই কেস অন্য সব কেস থেকে আলাদা। বিপদ প্রচণ্ড। আর শুধু আমাদের নয়, একটা ছোট্ট ছেলের জীবন জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। একটু এদিক-ওদিক হলেই জীবন সংশয়। আর আমি ফ্যালাকে কথা দিয়েছি। হাবুকে ফিরিয়ে

আনব, নয়তো গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেব।' আমরা ট্যাক্সি নিয়েই যাব ঠিক হল।

একদিন পর অমাবস্যা। সকাল থেকে সময় যেন আর কাটতেই চাইছে না। কলেজে গেলাম না। ফেলুদা সারাদিন ঘর বন্ধ করে কী করল কে জানে। মুখ দেখে বুঝলাম প্রচণ্ড চিন্তায় আছে। গতকাল বিকেলে ভাই এসেছিল আমাদের বাড়িতে। বলে দিয়েছে ঠিক কী কী করতে হবে। রাত ন-টা। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সি নয়। ভাড়া করা গাড়ি। ভাই নেমে এল গাড়ি থেকে। আমি আর ফেলুদা পিছনে বসলাম, ও সামনে বসে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। শীতের রাত। চারিদিকে কুয়াশা। সেদিন আবার শহরের বেশিরভাগ পাড়াতেই লোডশেডিং। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু ঠাহর পাওয়া মুশকিল। সেই নিকষ কালো জমা অন্ধকারে আলো বলতে গাড়ির হলুদ হেডলাইটটুকু। ডিকিতে কী যেন ভারী জিনিস ভরা আছে। নড়ছে। 'ডিকিতে কী ভরা?' ফেলুদা জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের ভেতরে যাবার টিকিট,' অদ্ভুত হেসে উত্তর দিল ভাই।

অন্ধকারে অলিগলি ঘুরে ঠিক কোথায় এসে পড়লাম জানি না। গাড়ি এসে থামল যেখানে, সেটা একটা গুদামের মতো। পাশে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা নদী। খুব কান পেতে শুনলে ভেতরে শোনা যাচ্ছে চাপাস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ আর ঘণ্টার শব্দ। কারা যেন গান গাইছে, 'কালী কালী বলরে ভাই/ কালী বিনে আর গতি নাই।'

ভাই দরজার সামনে গিয়ে তিনবার খুব স্পষ্ট টোকা দিল। চুলের মতো সরু ফাঁক করে খুলে গেল লোহার দরজা। ভাঙা

ভাঙা গলায় কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'কেন এসেছ?'

'মা ডেকেছেন।'

'সঙ্গে কারা?'

'মা-র ছেলেরা।'

'কোন বিভাগ?'

'ধনকালিকা।'

'উপবিভাগ?'

'কৃষ্ণানন্দ।'

'উপঢৌকন এনেছ?'

'হ্যাঁ। গাড়ির ডিকিতে রাখা আছে।'

'তবে, ভিতরে আসা হোক।'

ভিতর থেকে ষণ্ডামতো দুটো লোক বেরিয়ে এল। একজনের হাতে জোরালো টর্চ। গাড়ির ডিকি খুলে কাপড়ে জড়ানো লম্বা মতো কী-একটা বের করে দু-জনে ধরাধরি করে নামিয়ে রাখল। লম্বায় প্রমাণ সাইজের মানুষের মতো। আমি সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম দেখে ভাই তাড়া দিল, 'দেখার কিছু নেই। চলে আসুন, স্যার।' ভেতরে ঘন অন্ধকার। আমাদের যে ঢোকাল, তার হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। কিছুটা গিয়ে আমাদের পায়ের জুতো খুলে রাখতে বলা হল। ঠান্ডা কনকনে মেঝে। একটা বাঁক ঘুরতেই নাকে এল তীব্র ধূপধুনোর গন্ধ। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে গর্ভগৃহে। সেখানে ঢুকে প্রথমে মনে হল আগুন লেগে গেছে। তারপর বুঝলাম ধুনুচির ধোঁয়ায় চারিদিক ঢেকে আছে। জ্বলছে হ্যাজাক। আর সামনে বিশাল কালীমূর্তি। দেবীর গায়ের রং কাজলের মতো কালো। তাঁর চোখ দুটি রক্তপিঙ্গল বর্ণের।

চুলগুলি আলুলায়িত, দেহটি শুকনো ও ভয়ংকর, নীচের দুই হাত খালি। কাঁপা কাঁপা আলোতে তাঁর মুখের হাসি যেন আরও চওড়া আর ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। দেবীর গায়ের রং এতটাই চকচকে যেন সদ্য রং করা হয়েছে। দেবীর পায়ের তলায় বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা। দেবী যেন শূন্যে ঝুলে রয়েছেন। ফেলুদার দিকে তাকিয়ে দেখি ওর ভুরু আবার কুঁচকে গেছে। বিড়বিড় করে বলল, 'হাত খালি কেন?'

হঠাৎ নাকে এল পচা মাংসের বীভৎস গন্ধ। ধূপের ধোঁয়া এ গন্ধ ঢাকতে পারেনি। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছিল। তবু তার মধ্যেই দেখতে পেলাম রক্তাম্বর পরা দুই দীর্ঘদেহী মানুষ একটা নিথর দেহ এনে মূর্তির পায়ের কাছে রাখল। ফাঁকা জায়গাটা ভরে গেল একেবারে। দেবী এখন সত্যিকারের এক মৃতদেহের ওপর নৃত্যরতা। এই তবে আমাদের টিকিট!

'কাঁটাপুকুর মর্গ থেকে চুরি করে এনেছি, স্যার। এটা না আনলে ঢুকতে দিত না। দলে ঢোকার প্রথম ধাপ,' পাশের থেকে ফিসফিস করে ভাই বলল। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া সেই মৃতদেহ, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া চামড়া।

চারিদিকে বেজে উঠল তীব্র ঢোলের বাদ্যি। কেউ একজন ফুঁকতে লাগল হাড়ের শিঙা। একসঙ্গে ঢুকলেন সাতজন কাপালিক। সকলের পরনে রক্তাম্বর। পেছন ফিরে থাকায় কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ খেয়াল করে দেখলাম আমাদের আশেপাশেও ভিড় বেড়েছে। আলো-আঁধারিতে বোঝা না গেলেও জনা তিরিশ লোক তো হবেই। ভাইও দেখলাম ভয় পেয়েছে। ওর চোখে-মুখে অস্বস্তির ছাপ। শুধু ফেলুদার মুখে কোনো

অভিব্যক্তি নেই। যেন পাথরে কোঁদা মূর্তি।

দেবীর আরতি শুরু হবে। বিশালদেহী এক পুরোহিত বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, 'সবাই এবার মায়ের নাম করো। মায়ের নামে জরা দূর হবে। শত্রু নাশ হবে। কার্য সিদ্ধি হবে। যে শক্তির সন্ধানে এসেছ, মা সেই শক্তি দেবেন।'

মন্ত্রে গম গম করে উঠল গোটা ঘর—

ওঁ শবারুঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংস্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহু।
চতুর্ব্বাহু যুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।

ধুনোর ধোঁয়ায় চোখ জ্বলতে লাগল। সবার দেখাদেখি আমরাও মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। মাথা উঠিয়ে ফেলুদার দিকে তাকাতেই থমকে গেলাম। বাজ পড়লে লোকে স্ট্যাচু হয়ে যায় শুনেছি। দেখিনি। ফেলুদার অবস্থাও সেরকম। আতঙ্ক, ঘৃণা, বিস্ময় সব কিছু মিলেমিশে এক হয়ে গেছে যেন। এই ফেলুদাকে আমি চিনি না। ওর স্থির চোখ তাকিয়ে আছে কালীমূর্তির দিকে। কিন্তু মূর্তি তো আগের মতোই আছে। না নেই। মূর্তির হাত আর ফাঁকা নেই। দুই হাতে কারা যেন ধরিয়ে দিয়েছে সদ্যকাটা দুই নরমুণ্ড। সে-মুন্ডু থেকে টপটপ রক্ত ঝরে মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মাথার বড়ো বড়ো চুল জড়িয়ে আছে মূর্তির আঙুলে... আর... আর একটা নরমুণ্ড আমাদের চেনা। নরমুণ্ড না বলে শিশুমুণ্ড বলাই ঠিক হবে বোধ হয়। এই চোখ, যা এখন বন্ধ, তাকে আমরা খোলা দেখেছি। যে ঠোঁট এখন বন্ধ, আমরা তার নড়াচড়া দেখেছি। গালের লাল জড়ুলটা হ্যাজাকের
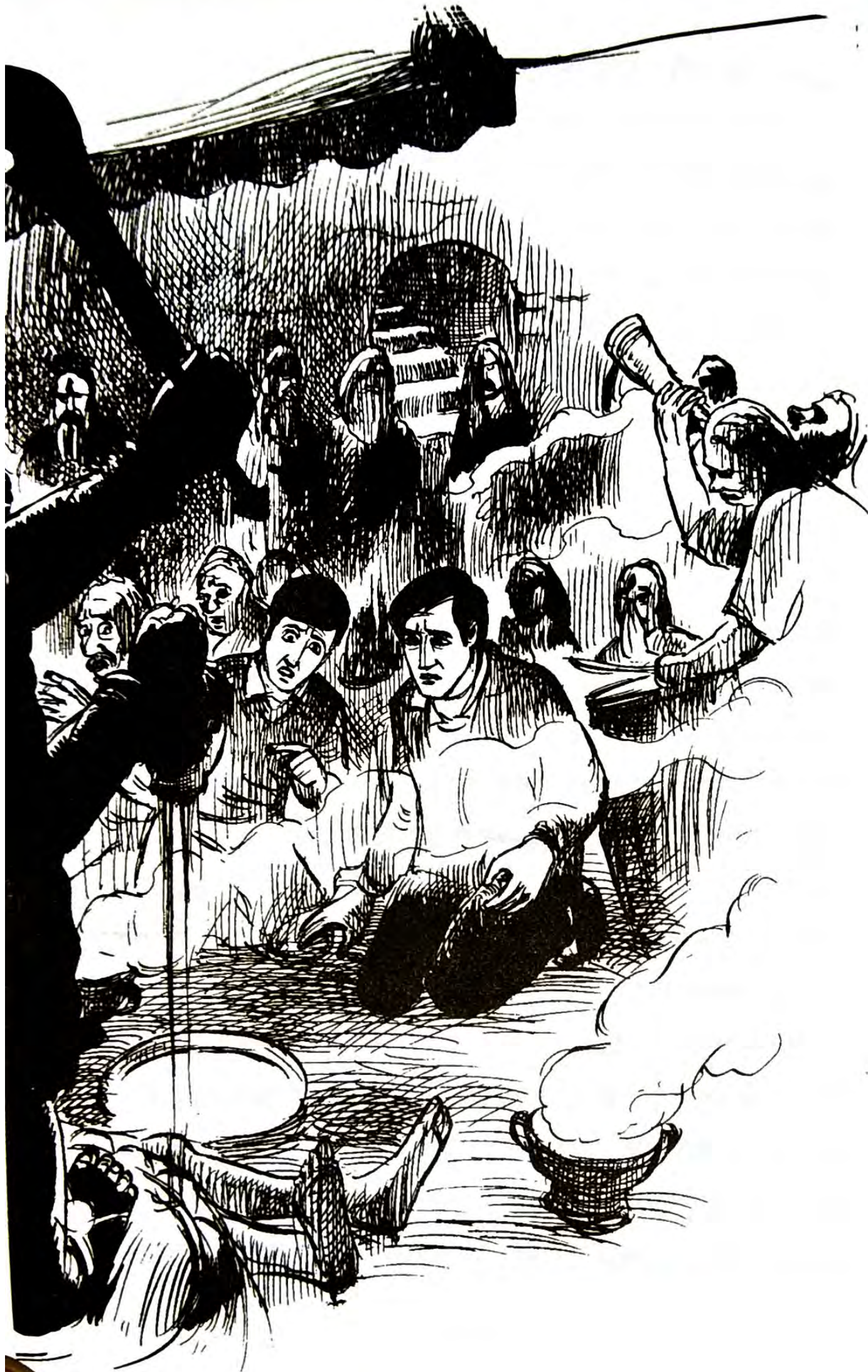
আলোতেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সুরজ বলেছিল... ও অনেক কিছু করতে পারে, যা ওর বাবাও করার কথা ভাবেনি। সুরজ করে দেখিয়েছে...

## ২৭

সেদিন কী করে বেরোলাম মনে নেই। ভেবেছিলাম ফেলুদা একটা বিহিত নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু সেদিনের পর থেকে ফেলুদা কেমন একটা চুপচাপ হয়ে গেল। ফ্যালাকে কথা দিয়েছিল, তার ভাইকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যে ফ্যালার ওপরেই চরম বিপদ নেমে আসতে পারে, ভেবেও দেখেনি। বোঝেনি আমাদের কাপালিকদের অধিবেশনে ঢুকতে দেওয়া থেকে গোটাটাই সুরজের প্ল্যানমাফিক। সুরজলাল চাইলে ওখানেই ফেলুদাকে শেষ করতে পারত। করেনি। যা করল তা আরও খারাপ। এই দুঃসহ ঘটনার স্মৃতি সারাজীবন ফেলুদাকে বয়ে চলতে হল। গোয়েন্দা হিসেবে ফেলুদার এটাই শেষ কেস। এর পরে যতদিন বেঁচে ছিল গোয়েন্দাগিরির ধারেকাছে যেত না। মানুষটাই কেমন বদলে গেল। অজানা এক বিষণ্ণতা ওকে ঘিরে থাকত সারাক্ষণ। খবরের কাগজ পড়ত না। চাকরিবাকরি আর করেনি কোনোদিন। খেয়াল হলে মাঝে মাঝে নানা ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ করে দু-পয়সা হাতে পেত।

লালমোহনবাবু চলে গেলেন এইট্টিতে। হার্ট অ্যাটাক। হরিপদবাবু খবর পেয়ে আমাদের জানান। আমি গেছিলাম। ফেলুদা যায়নি। বলল, 'লোকটার হাসিমুখটাই মনে রাখতে চাই রে। জটায়ুকে এভাবে দেখতে পারব না।' আমি চার্টার্ড

অ্যাকাউন্টেন্ট হলাম। পসার বাড়ল। বিয়ে করলাম না, ফেলুদার মতোই। ফেলুদা আমাদের সঙ্গেই থাকত। বাবা চলে গেলেন এইট্টি থ্রিতে। তার দু-বছর পরে মা। আর আমাদের কাহিনির লেখক মানিকবাবু নাইনটি টু-তে। পর পর মৃত্যুসংবাদে ফেলুদার শরীর মন ভেঙে যেতে লাগল। সকালে ওঠা, যোগব্যায়াম বন্ধ করে দিল। সিগারেট খাওয়া বেড়ে গেল অনেকটাই।

১৯৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর। দিনটা সবার মনে আছে। সেদিন কলকাতা থেকে দেখা গেছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। সকাল থেকে ভাবছি আমি আর ফেলুদা চোখে চশমা লাগিয়ে গ্রহণ দেখব। ফেলুদা শেষ মুহূর্তে বলল 'তুই যা, তোপসে। আমার শরীর বিশেষ ভালো নয়।' ডায়মন্ড রিং দেখে নীচে নেমে দেখি সেই একভাবে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ, কপালে আলগোছে হাত রাখা আর বুকে *চ্যারিওটস অফ গডস* বইটা খোলা। দেখেই কেমন একটা লাগল। ঠেলা দিয়ে সাড়া পেলাম না। বাকিটা বুঝতে ডাক্তারের দরকার হয় না।

আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। জন্মদিনের দিন সব স্মৃতি ফিরে ফিরে আসছে। যে ক-টা দিন আছি, এই স্মৃতিগুলোর মুখোমুখি বসে থাকি বরং...

(*তোপসের নোটবুক* এখানেই শেষ। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম ভদ্রলোকের কোনো আত্মীয় আছে কি না। নেই। অকৃতদার অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। নোটবইটা আমার কাছে ছিল। এখান থেকেই কম্পিউটারে টাইপ করে পাণ্ডুলিপি লিখি। ছাপানোর ঠিক আগে প্রকাশক ভেবেছিলেন মূল নোটবইয়ের কয়েকটা পাতা ছবি তুলে লেখার সঙ্গে জুড়ে দেবেন। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখি নেংটি ইঁদুরে সবকটা পাতা কেটে ঝুরঝুরে করে দিয়েছে। একটা শব্দও আর পড়া যাচ্ছে না।)

# কৈফিয়ত

*তোপসের নোটবুক* হয়তো কোনোদিন আলোর মুখই দেখত না যদি না আমি *হোমসনামা* লিখতাম। ওই বইটার জন্য এক দীর্ঘ পড়াশুনো আর হোমসযাপন চলেছিল। আর সেটা করতে গিয়েই হোমসিয়ানার তিনটে খুব উল্লেখযোগ্য বই পড়ি। উইলিয়াম ব্যারিং গুল্ডের *শার্লক হোমস অব বেকার স্ট্রিট*, মিশেল হার্ডউইকের *শার্লক হোমস— মাই লাইফ অ্যান্ড ক্রাইম* এবং লেসলি ক্লিংগারের *নিউ অ্যানোটেটেড শার্লক হোমস*। এই তিনটে বইতে মূল উপজীব্য একটাই। হোমস সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন। হোমসকে তাই মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে তখনকার নানা ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে, এক নিবিড় অনুধ্যানে খোঁজার চেষ্টা হয়েছে হোমসের পরিবার আর পূর্বপুরুষদের। এই কাজটা যখন করছি, তখন স্বাভাবিকভাবে প্রথমেই যার কথা মনে হয়েছিল সে আমাদের একান্ত আপন প্রদোষ চন্দ্র মিত্র, ফেলুদা। হোমস যেমন লন্ডনের বেকার স্ট্রিটে থেকে যত দিন গেছে বিশ্ববাসীর ঘরের মানুষ হয়ে গেছেন, একমাত্র ফেলুদার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অবিকল একরকম। প্রতিটা বাঙালি ছেলে মেয়ে বেড়ে ওঠে নিজেদের তোপসে ভেবে। 'ব্যাপারটা ভালো লাগছে না রে তোপসে', 'মিসটেক, মিসটেক'... ফেলু কাহিনি থেকে ফেলু সিনেমার প্রতিটা বাক্য নিজেদের অজান্তেই বাঙালির প্রবাদের মতো হয়ে গেছে। তাই, গুরুকে নিয়ে যে কাজ হয়েছে, শিষ্যকে নিয়ে ঠিক তেমনটা করলে কেমন হয়?

ফেলুর পরিবারের ইতিহাস নিয়ে সত্যজিৎ অদ্ভুত নীরব। যতটা যা বলেছেন, ছোটোখাটো ক্লুয়ের আকারে তারা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ফেলু অভিযানের মধ্যে। তাই তাদের কালানুক্রমিক বিন্যাস বলে কিছু নেই। অনেক সময় তথ্যরা নিজেই নিজেদের বিরোধিতা করেছে। ফলে সব

মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলুকে নিয়ে এক সম্পূর্ণ চিত্রের দরকার বোধ করছিলাম দারুণভাবে। কিন্তু এটা লিখবে কে? আমার সে-সাধ্য নেই। একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি শ্রীমান তপেশ রঞ্জন নিজে। কেমন হয় যদি তার কোনো হারানো ডায়েরি বা নোটবুক খুঁজে পাওয়া যায়? যেমন স্বয়ং সত্যজিৎ প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরি খুঁজে পেয়েছিলেন বা একটা হারানো ডায়েরি পেয়েছিলেন বিশ্বজিৎ রায়! বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। তাই অচিরেই কলেজ স্ট্রিটে ঠিক একইভাবে তোপসের লেখা একটা নোটবই খুঁজে পেলাম। একে বই আকারে আনব সে-দুঃসাহস ছিল না। তাই ফেসবুকেই অধ্যায়ে অধ্যায়ে সারসংক্ষেপ প্রকাশ করতে শুরু করলাম। অভূতপূর্ব সাড়া পেলাম সেখানে। বিশেষ করে ফেলুদা ফলোয়ার্স নামে গ্রুপটি এবং তার সদস্যরা ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গেছেন। এক পর্ব প্রকাশ হলেই জানতে চেয়েছেন পরের পর্ব কবে!

ঠিক তাই 'অহর্নিশ' পত্রিকায় এই নোটবুক প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু আকারে বড়ো হয়ে যাওয়ায় সরাসরি বই হিসেবে প্রকাশ। একটা কথা এখানে বলে রাখি, এই নোটবইতে শেষটা বড়োই করুণ। ফেলুদার ভক্ত হিসেবে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। ছোটোবেলার নায়কের পরাজয় বা মৃত্যু কে-ই বা মেনে নিতে পারে? প্রতিবার মনে হয়েছে, এ হতে পারে না। অসম্ভব। তারপরেই ভেবেছি অ্যালান মুরের *ওয়াচমেন* বা মিলারের *ডার্ক নাইট* — এর কথা। সেখানে তো সুপার হিরোদেরও পতন হয়েছিল। মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু তবু তাঁদের ক্যারিশমা কমেনি এতটুকুও। আগাথা ক্রিস্টি এই সত্যটা জানতেন। তাই পোয়ারো আর মিস মারপেলের মৃত্যু লিখে গেছিলেন নিজের হাতে। ব্যোমকেশ বা ফেলুদার ব্যাপারটা আলাদা। তাদের মৃত্যু নেই। কিন্তু যখনই তাদের একেবারে সত্যিকারের মানুষ বলে ভাবব, তখনই তো মরমানুষের সবটুকু দোষগুণও তাদের থাকতেই হবে। তাই না?

আমার সদ্য কিশোরবেলা থেকে আজও সত্যজিৎ-এর লেখা

নানাভাবে আমায় দিশা দেখায়। অন্য সব বাঙালির মতো ছোটো থেকেই ফেলুদা আমার হিরো। কতবার ভেবেছি সোওজা চলে যাব রজনী সেন রোডের সেই বাড়িটায় যাতে বেল টিপলেই 'আসছিইই' বলে দরজা খুলে দেবে তোপসে নিজে। ঘরে ঢুকেই দেখব চেয়ারে এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে সিগারেট হাতে বসে আছে ফেলুদা। পিছনে যামিনী রায়ের আঁকা ছবি। দেওয়ালে কাঠের আলমারিতে খবরের কাগজের মলাট দেওয়া কত বই! উলটোদিকে সদ্য প্রকাশিত বই *মিসিসিপিতে মৃত্যুহানা* নিয়ে হাসি হাসি মুখে জটায়ু বলছেন, 'এবারেরটায় তথ্যে আর কোনো ভুল পাবেন না মশাই।' বসতেই শ্রীনাথদা এনে দেবে চা, সঙ্গে গরম চানাচুর আর ডায়মন্ডা। ফেলুদা আমায় বলবে, 'তুমি অশোকনগর থেকে আসছ?' আমি চমকে যেতেই একপেশে হাসি হেসে আঙুল দিয়ে দেখাবে, 'তোমার টিকিটের একটা অংশ এখনও পকেটের বাইরে বেরিয়ে আছে...' আড্ডা শুরু হবে...

এই বই সেই না পাওয়া আড্ডাটুকুকেই ছুঁতে চাওয়া, আর কিচ্ছু না...